পূজা-পার্বণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজা-পার্বণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যানিধি

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৮ আশ্বিন

মূল্য চার টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

ভূমিকা

আমাদের পূজা-পার্বণ অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থানভেদে পার্বণেরও ভেদ আছে। পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি পার্বণ পূর্ববঙ্গে নাই, পূর্ববঙ্গের কতকগুলি পশ্চিমবঙ্গে নাই। সকল পার্বণের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ নারীদের ব্রতকথা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ। স্থানভেদে সেসকল ব্রতকথারও রূপান্তর আছে।

পূজা-পার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতি না জানিলে কথা মাত্র হয়, ইতবৃত্ত হয় না। আমি এই পুস্তকে কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজা-পার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছি। ইহা হইতে পূজা-পার্বণের প্রয়োজনও স্পষ্ট হইবে। বঙ্গে যেমন পূজা-পার্বণ আছে, অন্যান্য প্রদেশেও তেমন আছে। এইসকল পূজা-পার্বণই হিন্দুজাতিকে এক-সূত্রে বদ্ধ করিয়াছে; আচার-পালন দ্বারাই হিন্দু জাতিস্মর হইয়াছে।

দুর্গোৎসব বঙ্গের এক বৃহৎ উৎসব। কত বিদ্বান্ ইহার কত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কত পুরাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু রূপক ও পুরাণের শরণ লইলেই উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায় না। এই পূজা প্রায় সহস্র বৎসর চলিয়া আসিতেছে; বৎসর-গণনার আদি-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে বলে, গত পূজার পরে এই হইয়াছিল। নানা পুরাণে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা সেসব পুরাণ উদ্ধৃত করিয়া পূজার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ মহিষাসুর-বধের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন, তিনি যজ্ঞ-রূপা, অগ্নিস্বরূপা। কিন্তু অদ্যাপি কেহই দুর্গাপূজার উৎপত্তি এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ প্রকৃতি চিন্তা করেন নাই। এই পুস্তকে আমি দুর্গাপূজার ইতিহাস অন্বেষণ করিয়াছি। যে ইতিহাসে দেশ ও কালের উল্লেখ না থাকে, সেটা ইতিহাস নয়।

নানা প্রদেশে রচিত পুরাণে দুর্গাপূজার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেসব আমাদের দুর্গাপূজায় একত্র হইয়া ইহাকে জটিল ও বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে। কেহ মনে করিয়াছেন, ইহা শবর জাতির উৎসব ছিল। কেহ মনে করিয়াছেন, আসামের অসভ্য পার্বত্য জাতির নিকট হইতে হিন্দুরা দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান শিখিয়াছে। কিন্তু দুই ক্রিয়ার মধ্যে দুই-এক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেই এক হইতে অপরের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না।

পাঠক এই পুস্তকে বহু নূতন ও ভারতের অজ্ঞাতপূর্ব ইতিহাস জানিতে পারিবেন। নূতন বলিয়াই বহু পাঠক এই ইতিহাস একবার পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন না। দুই তিন বার পড়িলে দেখিবেন, স্মৃতি ও পুরাণ কি অপূর্ব কৌশলে আমাদের ইতিহাস জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছেন! এতদ্দেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় বিদ্বানেরা আর্যকৃষ্টির প্রাচীনতা অনুমানে ভ্রম করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে আর্যকৃষ্টির প্রাচীনতার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট সেসব প্রমাণ সুবোধ্য নয়। পুরাণ বেদ-বাহ্য নয়। পুরাণকার পূজা-পার্বণে বেদেরই স্মৃতি সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। যাহাঁরা বঙ্গের কিম্বা ভারতের ইতিহাস লিখিতেছেন তাহাঁরা আমাদের পূজা-পার্বণ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখিতেছেন। যদি বা কেহ কেহ পূজা-পার্বণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাঁরা উৎপত্তি নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন।

কাল নির্দেশ করিতে গেলেই জ্যোতিষ আসিয়া পড়ে। জ্যোতিষের নামে ভয় পাইবার কিছু নাই। যিনি পাঁজি দেখিতে পারেন তিনি যতটুকু জ্যোতিষ জানেন, ততটুকু জ্ঞান থাকিলেই এই পুস্তকে বর্ণিত কালগণনা বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

বাঁকুড়া
১৩৫৮ শ্রাবণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

আমাদের পূজা ও পার্বণ

দোলযাত্রা

দোলযাত্রা চিন্তা করিতেছিলাম। কি জানি কেন, মনে মনে বলিতে-ছিলাম, হে অতীত! কথা কও, কথা কও। অকস্মাৎ শুনিতে পাইলাম—

—আমি কথা কহিতেছি, তুমি শুনিতে পাও না। বর্তমানে আমি আছি। আমাকে ছাড়িয়া বর্তমান দাঁড়াইতে পারে না।

—যদি আছ, বল, দোলযাত্রার উৎপত্তি কি। কত বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছিলে?

—ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ করিতেন। তোমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল ছয় সাত সহস্র বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছি, ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় দোল দেখিয়াছি।

—তুমি পরমাশ্চর্য কথা কহিতেছ। পশ্চিম-দেশের বিদ্বানেরা কহিয়াছেন, সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমি ভারতের অতীত, না, অন্য দেশের অতীত?

—আমি ভারতের অতীত। আমি অন্য দেশ জানি না। বিদ্বান্‌দের উক্তি স্বেচ্ছা-কল্পিত, কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

—তোমার কি প্রমাণ আছে? কে সাক্ষী আছে?

—চন্দ্র-সূর্য কাল পরিমাণ করিতেছেন। তাহাঁরা আমার সাক্ষী। দোল-যাত্রাতেই সাক্ষী পাইবে।

তবে দোলযাত্রাই দেখি। দোলযাত্রা। যাত্রা শব্দের অর্থ গমন। পরে অর্থ আসিয়াছে, দেবতার উৎসব। যে দেবতা গমন করেন, বহু লোক তাঁহার অনুগমন করে, তখন বলি যাত্রা। যেমন, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। দুর্গাপূজার সময় দুর্গা গমন করেন না, দুর্গাযাত্রা বলিতে পারি না। দোল, দোলন। ঋজুপথে কিম্বা বৃত্তপথে এদিক হইতে

সেদিক, সেদিক হইতে এদিক গমনাগমনের নাম দোলন। দোলন হ্রস্ব হইলে বলি কম্পন। কেহ কেহ কথা কহিবার সময় মাথা দোলায়, শীতে হাত-পা কাঁপিতে থাকে।

কে দোলেন? বিষ্ণু। জগদম্বার পালনী শক্তির নাম বিষ্ণু। সূর্যে সে শক্তি নিহিত আছে। সূর্য তাপ আলোক বিকিরণ করিতেছেন। বর্ষ-চক্রে ভ্রমণ করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুপর্যায় আনিতেছেন, যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবিত আছে। সূর্য-রূপ বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলেন, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি। মধ্যাহ্ন-কালে কভু মাথার উপরে আসেন, কভু বহু দক্ষিণে থাকেন। মাঠে একস্থান হইতে দিকচক্রে সূর্যোদয় দেখিলে দূরস্থ বৃক্ষদ্বারা সূর্যের উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনাগমন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দক্ষিণে গমন করিতে করিতে গতি মন্দ হয়। একস্থানে দুই-তিন দিন স্থির মনে হয়। তার পর উত্তরাভিমুখ হন। উত্তরে গমন করিতে করিতে গতি মন্দ হয়, এক স্থানে দুই-তিন দিন স্থির মনে হয়। দক্ষিণা গতি দক্ষিণায়ন, উত্তরা গতি উত্তরায়ণ। অয়ন শব্দের অর্থ গতি। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, বর্তমানে আমাদের ৭ই পৌষ। ২১শে জুন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়, বর্তমানে আমাদের ৮ই আষাঢ়।

আমাদের আর্য পিতামহগণ পঞ্জাবে বাস করিতেন। সেখানে অতিশয় শীত। উত্তরায়ণ আরম্ভ-দিনে দিবা দশ ঘণ্টা, রাত্রি চৌদ্দ ঘণ্টা। সূর্য মাথা হইতে বহু দক্ষিণে থাকিয়া দিনযাত্রা নির্বাহ করেন। পরে উত্তর দিকে যত আসিতে থাকেন, তাপ ও আলোক বাড়িতে থাকে, জীবকুলের জড়তার অবসান হইতে থাকে, প্রাণী ও উদ্ভিদের কর্মচেষ্টা বাড়িতে থাকে। এই হেতু ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ উত্তরায়ণ আরম্ভের পরের দুই মাসের সূর্যকে সবিতা বলিতেন। তিনি ভূমি অন্তরীক্ষ স্বর্গ প্রসব করিয়াছেন। তিনি জীবকুল বাঁচাইয়া রাখেন। আমরা শীত বা শিশির ঋতু বলি, তাঁহারা হিম. (অকারান্ত) বলিতেন। আর, উত্তরায়ণ আরম্ভ-দিন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ করিতেন। সে বৎসরকেও হিম. বলিতেন। সেদিন সবিতার পূজা ও হোম হইত, তাঁহারা বলিতেন যজ্ঞ।

ইয়োরোপেও উত্তরায়ণ আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। ভুলে ১লা জানুআরি হইতেছে, ২৩শে ডিসেম্বর হওয়া উচিত ছিল। আমরাও উত্তরায়ণ দিন স্মরণ করি। ষোল শত বৎসর পূর্বে পৌষ-সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-খাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকরস্নান।

উত্তরায়ণ আরম্ভের ছয়মাস পরে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়, বর্ষাঋতু আসে। ইন্দ্র বর্ষণ করেন, শস্য জন্মে। এই কারণে ইন্দ্র-যজ্ঞ অবশ্য-কর্তব্য হইয়াছিল। সবিতৃ-যজ্ঞের দিন ও ইন্দ্র-যজ্ঞের দিন না জানিলে নয়। সূর্য দেখিয়া জানিতে পারা যায় না। তিন দিন পূর্বে সূর্যকে যেমন দেখিয়াছি, আজিও তেমন দেখিতেছি। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে উষার পূর্বে কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, তাহা দেখিয়া উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ-দিন নিরূপণ করিতেন।

সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। সূর্যের প্রকাশকালে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্র এমন নয়, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, নক্ষত্রের পাশ দিয়া যাইতে আসিতে দেখি। বৎসরে ১২টা পূর্ণিমা হয়। যে নক্ষত্রের সহিত পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়, সে নক্ষত্র দ্বারা পূর্ণিমা চিনিতে পারা যায়। নক্ষত্র শব্দের সামান্য অর্থ তারা; বিশেষ অর্থ, নিকটস্থ কতকগুলি তারা-যোগে কল্পিত আকৃতি। যেমন সর্প, মৃগ ইত্যাদি। মঘা নক্ষত্র দ্বারা মাঘী পূর্ণিমা, ফল্গুনী নক্ষত্র দ্বারা ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি চিনিতে পারা যায়। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক মাস।

নক্ষত্র স্থির। যেটা যেখানে আছে, সেটা সেখানেই আছে। এই কারণে মাসও বর্ষাচক্রের এক-এক নির্দিষ্টস্থানে আছে। কিন্তু অয়নাদি-বিন্দু স্থির নাই, অল্পে অল্পে পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যাইতেছে। ফলে মনে হয়, মাস অগ্রগত হইতেছে। অয়নের সহিত ঋতু পিছাইতেছে, কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে। ইয়োরোপের মাস অয়নের সহিত বাঁধা, ঋতুও বাঁধা। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ আরম্ভ চিরদিন হইতেছে। কিন্তু আমাদের পাঁজিতে ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে পৌষ-সংক্রান্তিতে হইত, এখন ৭ই পৌষ হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ ঋতুজ্ঞানের নিমিত্ত আবশ্যক নক্ষত্র চিনিতেন, কল্পিত আকৃতি অনুসারে তাহাদের নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেসকল নক্ষত্র সমান সমান দূরে নাই। ঋগ্‌বেদের বহুকাল পরে জ্যোতিষীরা রবিপথ ২৭ সমান ভাগ করিয়া নিকটস্থ নক্ষত্রের নামে সেসব ভাগের নাম রাখিলেন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি নক্ষত্রভাগ কৃত্রিম। পাঁজির ফাল্গুনী পূর্ণিমা কৃত্রিম ফল্গুনী-নক্ষত্রে পূর্ণিমা, দৃশ্য ফল্গুনী-নক্ষত্রে নয়। বেদের কালে নক্ষত্র শব্দের এই তৃতীয় অর্থ ছিল না। ফল্গুনী নামে দৃশ্য ফল্গুনী বুঝাইত।

এখন দোলযাত্রা স্মরণ করি। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন বিষ্ণুর দোল হয়। বিষ্ণুমন্দির হইতে কিছুদূরে এক মণ্ডপ নির্মিত হয়, চারি দিক খোলা। চারি খুঁটির উপরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ। মণ্ডপে এক বেদী নির্মিত হয়। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতিরূপক। সন্ধ্যার পূর্বে বিগ্রহ মন্দির হইতে মণ্ডপে আনীত, বেদীতে স্থাপিত ও পূজিত হন। পরে হোম হয়। বিগ্রহের সিংহাসন তিন বার উত্তর-দক্ষিণে দোলিত হয়। ইহার পর বিগ্রহের গাত্রে ফাগ স্পর্শ করাইয়া উপস্থিত সকলে প্রসাদ-স্বরূপ কপালে মাখে।

দোল-পূর্ণিমার পূর্বদিন বহ্যুৎসব, চলিত নাম চাঁচর। গ্রামের বালক যুবক ও বৃদ্ধেরও আনন্দের ব্যাপার। খড়, বাঁশ, শরপাতা, তাল-পাতা ইত্যাদি যে গ্রামে যে জ্বালন যথেষ্ট পাওয়া যায়, তদ্‌দ্বারা পুকুর-পাড়ে কোথাও গৃহ, কোথাও পশু, কোথাও নরমূর্তি নির্মিত হয়। কোথাও কোথাও পিঠালীর ভেড়া গড়িয়া উক্ত গৃহে স্থাপিত হয়। এই ভেড়ার নাম মেণ্ঢাসুর। পরে সন্ধ্যার সময় বিপুল হর্ষধ্বনিসহ এইসকল মূর্তি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হয়। সংস্কৃত চর্চরী শব্দ হইতে চাঁচর আসিয়াছে। ইহার এক অর্থ উৎসবে হর্ষধ্বনি। কি যেন আপদ দগ্ধ হইল, তাহাতেই হর্ষ। বঙ্গ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে বহ্যুৎসব প্রসিদ্ধ। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রদেশে দোল নাম, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে হোলি নাম প্রচলিত। হোলি শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। সংস্কৃত রূপে ইহা হোলাকা, হোলিকা হইয়াছে। (এই নাম পুরাতন। আমার বোধ হয়, উত্তর-ভারতের দেশজ শব্দ। ইহার অর্থ মেষ বা ছাগ হইতে পারে)। বঙ্গদেশে হোলি

নাম অজ্ঞাত ছিল। কয়েক বৎসর হইতে উত্তর-ভারতের লোকদিগের মুখে প্রচারিত হইয়াছে। নগর হইতে গ্রামে গ্রামে এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহারা হোলির সময় রঙ্গচূর্ণ ও রঞ্জিত জল পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক করে। সেদিন উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় গান হয়। অকথ্য ভাষা পরস্পরের প্রতি প্রযুক্ত হয়। সেদিন পথে নারী বাহির হয় না। (কয়েক বৎসর হইতে শিষ্টজনে উক্ত পুরাতন আচারের বিরোধী হইয়াছেন)।

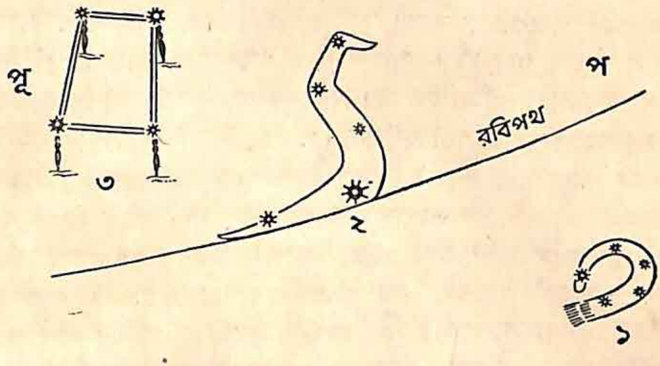
কেহ কেহ দোলযাত্রাকে বসন্তোৎসব মনে করিয়াছেন। কিন্তু, বসন্তোৎসব নামে কোন উৎসব পাঁজিতে নাই, স্মৃতিতে নাই, পুরাণে নাই। পূর্বকালে মদনোৎসব হইত, বহুদিন অজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা নয়, চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী। দ্বিতীয়তঃ দোলযাত্রা একটি নয়, বৎসরে দুইটি। একটির নাম দোল, অপরটির নাম হিন্দোল, চলিত নাম ঝুলনযাত্রা। সূর্যরূপ বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলায় আরোহন করেন। ইহা প্রত্যক্ষ। হিন্দোল বর্ষাকালে, বসন্ত বর্ষাকালে আসে না। তৃতীয়তঃ, বসন্তোৎসব ও বহ্যুৎসব বিরুদ্ধ যোগ। বহ্যুৎসবে কে দগ্ধ হয়? কেন হয়?

তবে দোলযাত্রা কি? কবে ইহার উৎপত্তি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করি। ফাল্গুনী পূর্ণিমা দক্ষিণায়ন-কালে হইতে পারিত না। উত্তরায়ণ আরম্ভ কালেই হইতে পারিত। অতএব জানিতেছি, এক সময়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। কারণ, সেদিন বিষ্ণুর দোল। কত বৎসর পূর্বে হইত?

ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, প্রত্যেকটিতে দুইটি তারা। চারিটি তারায় যেন শয্যা, শয্যার চারি কোণে চারি তারা (চিত্র ১)। একজোড়া তারার উদয়ের পর অন্য জোড়ার উদয় হয়। প্রথম জোড়ার নাম পূর্ব-ফল্গুনী, দ্বিতীয় জোড়ার নাম উত্তর-ফল্গুনী। যেন দুই অর্জুন গাছ, শাখা নাই, শ্বেত-বর্ণ গাছ দাঁড়াইয়া আছে। পুরাণে বলে, কৃষ্ণ যমল-অর্জুন বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ছিলেন। সে অর্জুন এই। ঋগ্বেদে ফল্গুনীর নাম অর্জুনী (চিত্র ২)।

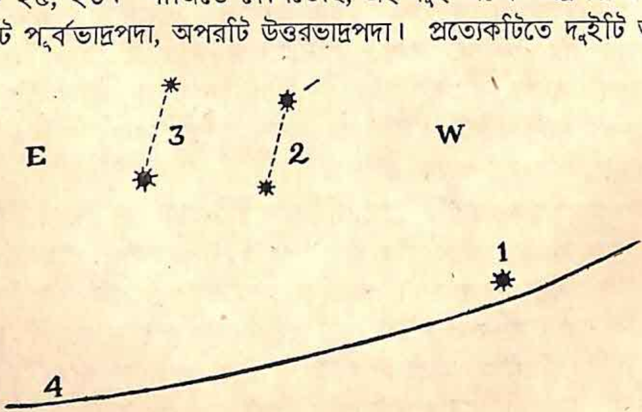
যেদিন রবি অস্তগত হইবা মাত্র পূর্বদিকচক্রে চন্দ্র দেখা যায়,

সেদিন চন্দ্র পূর্ণ দেখায়, পূর্ণিমা হয়। সে সময়ে চন্দ্র ও রবি বিপরীত দিকে থাকে। একের চতুর্দশ নক্ষত্রে অন্যটি থাকে। কারণ, রবিপথে



চিত্র ১। ১—অশ্লেষা, ২—মঘা, ৩—ফল্গুনীদ্বয়

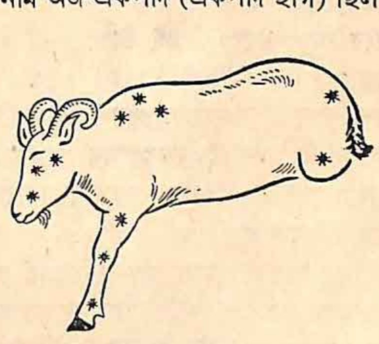
২৭টি নক্ষত্র ভাগ। ফল্গুনী দ্বয়ের অঙ্ক ১১, ১২। চতুর্দশ নক্ষত্রের অঙ্ক ২৫, ২৬। পাঁজিতে দেখিতেছি, এই দুই অঙ্কে ভাদ্রপদা নক্ষত্র। একটি পূর্বভাদ্রপদা, অপরটি উত্তরভাদ্রপদা। প্রত্যেকটিতে দুইটি তারা,



চিত্র ২। 1 —মঘা, 2 —পূর্বফল্গুনী, 3 —উত্তরফল্গুনী, 4—রবিপথ

চারিটি তারা যেন এক গৃহের চারি কোণে আছে। ইহা হইতে জানিতেছি, সেদিন রবি ভাদ্রপদা নক্ষত্রে, ২৬ অঙ্কের নক্ষত্রে থাকিত, আর সেদিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। তৎকালে দৃশ্য ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইত (বর্তমান পাঁজিতে ফল্গুনী নক্ষত্রভাগে ১৩।২০ অংশাদির মধ্যে যে-কোন স্থানে হইতে পারে)। উত্তরায়ণাদির বিপরীত দক্ষিণায়নাদি। অতএব ফল্গুনী নক্ষত্রে রবি আসিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। মহাবিষুব হইতে দক্ষিণায়নাদি বিন্দু ৯০ অংশ দূরে। তৎকালে ফল্গুনী নক্ষত্র ৯০ অংশ দূরে ছিল। বর্তমানে দেখিতেছি, দুই ফল্গুনীর মধ্যস্থান ১৬৫।৩০ অংশাদি দূরে আছে। ইহা হইতে ৯০ অংশ বিয়োগ করিলে ৭৫।৩০ অংশাদি থাকে। অয়ন এক অংশ পিছাইতে ৭৩ বৎসর লাগিত। অতএব, ৭৫।৩০ অংশাদি পিছাইতে ৭৫½×৭৩=৫৫১১½ বৎসর লাগিয়াছে। উত্তর-ফল্গুনী ধরিলে আরও ৪০০ বৎসর বাড়িবে। তখনকার উত্তরায়ণ আরম্ভ-দিন এখনকার ৭ই পৌষ।

বহ্ন্যুৎসবে গৃহ ভস্মীভূত হয়। সে গৃহ ভাদ্রপদার প্রতিরূপক। কিন্তু ঋগ্বেদের কালে ভাদ্রপদার নাম অজ-একপাদ (একপাদ ছাগ) ছিল। যে মেষ বা মেণ্ঢা দগ্ধ হয়, সে এই অদ্ভুত ছাগ (চিত্র ৩)। দোলযাত্রার উৎপত্তি অতীব পুরাতন। লোকে জানে না, গৃহ কেন, মেণ্ঢা কেন, কিছুই জানে না। মেণ্ঢাকে অসুর কল্পনা করিয়াছে, যেন কোন অসুর সূর্যকে উত্তরায়ণ স্থানে আসিতে বিলম্ব করাইতেছে, সে ভস্মীভূত হইলেই রৌদ্র বাড়িবে, দিবামান বাড়িবে। কৃষ্ণ যমল-অর্জুন বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' এক চণ্ডীদাস অর্জুন বৃক্ষকে অসুর কল্পনা করিয়াছেন।



চিত্র ৩। অজ-একপাদ (মেণ্ঢাসুর)

দোলোৎসব নববর্ষোৎসবও বটে। বঙ্গে দোল-দুর্গোৎসব কথা মাত্র আছে। দুর্গোৎসব দেখি, দোলোৎসব দেখিতে পাই না। বঙ্গে দুর্গোৎসবে আমাদের যে আনন্দ, দোলোৎসবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয়ের সে আনন্দ। বস্তুতঃ, দুর্গোৎসবও এক নববর্ষোৎসব। নববর্ষোৎসবের কয়েকটি লক্ষণ আছে। দুর্গোৎসব স্মরণ করিলে সে সে লক্ষণ স্পষ্ট হইবে। আমরা গৃহাদি মার্জনা করি, তৈজসপত্রাদি উজ্জ্বল করি, রন্ধনের নূতন হাঁড়ি কাড়ি, নববস্ত্র পরিধান করি, আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হই। আর, বিজয়াদশমীতে প্রতিমাবিসর্জনের পর পরস্পরের গাত্রে জল ও কর্দম নিক্ষেপ করি, সিদ্ধি পান করি। আর স্থান বিশেষে, লোকে অশ্লীল গীত ও ক্ষেউড় শুনিত। কালিকা-পুরাণ ইহার বিধান দিয়াছেন, লোকের কুরুচি বলিবার জো নাই। ইহার নাম শবরোৎসব। বোম্বাই, মধ্য ও উত্তর ভারতে হোলির দিন এইসকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। নববর্ষ-প্রবেশে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক, কিন্তু ক্ষেউড় স্বাভাবিক নয়। লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু, কর্ণ কিম্বা দেহ অশুচি করিলে সে বৎসর যমদূত স্পর্শ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ অন্ত্যজ স্পর্শদ্বারা দেহ অশুচি করে, পরে স্নান করে। এই বিশ্বাস অল্পকালের নয়, অন্ততঃ সাড়ে চারি সহস্র বৎসর হইতে আছে। ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালে সম্বৎসরব্যাপী সত্রের পর এইরূপ অশ্লীল ক্রীড়াকৌতুক হইত। আমার বিশ্বাস, বৈদিককালের সোমরস বর্তমান ভাং (সিদ্ধি)। আমরা বিজয়াদশমীতে সিদ্ধি পান করি। হোলির দিন উত্তর-ভারতে ভঙ্গা-পান প্রচুর চলে।

কোথাও কোথাও চৈত্র-পূর্ণিমায় দোল হয়। অর্থাৎ, বিষ্ণু সেদিন উত্তরায়ণ আরম্ভ করিতেন (শারদোৎসব পশ্য)। ফাল্গুন-পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ছয় সহস্র বৎসর অতীতের সাক্ষী। চৈত্র-পূর্ণিমায় দোল উহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বের সাক্ষী। এই সাক্ষীর সাক্ষী আছে।

চৈত্র-পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ, অতএব আশ্বিন-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। আমরা আশ্বিন-পূর্ণিমায় কোজাগরী-লক্ষ্মীপূজা করিয়া সে স্মৃতি পালন করিতেছি। সে সময়ে বর্ষা আরম্ভ হইত, দিগ্‌গজ এই

হেতু লক্ষ্মীকে স্নান করায়। গজলক্ষ্মী প্রতিমায় দুই পার্শ্বের দুই হস্তী শুণ্ডদ্বারা ঘট ধরিয়া লক্ষ্মীর মাথায় জল সেচন করে।

কালের স্রোত বহিতে লাগিল। উত্তরায়ণারম্ভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে পিছাইয়া মাঘী পূর্ণিমায় আসিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কথা। প্রথমে দৃশ্য মঘায়, পরে কৃত্রিম মঘায় পূর্ণিমা ধরা হইত। এইরূপে উত্তরায়ণাদি মাঘী পূর্ণিমায় ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। সেইকালে ছয় মাস পরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়নাদি হইত। হিন্দোল তাহারই স্মৃতি। উত্তরায়ণের এক মাস পরে বসন্ত আসে। মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ, অতএব ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্ত-প্রবেশ। এই-রূপে, এই পূর্ণিমা বসন্ত-পূর্ণিমাও বটে।

কিন্তু ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিষ্ণুর দোল ও নববর্ষারম্ভ। সেদিন মদনোৎসব হইতে পারে না। চন্দ্র ২৭ দিন পরে ফল্গুনী নক্ষত্রে আসে। সে দিন চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী। এই দিন মদনের পূজা হইত। সংস্কৃত-নাটকে মদনোৎসবের বর্ণনা আছে। হোলিকে মদনোৎসব মনে করাতে মদন-পূজা অজ্ঞাত হইয়াছে।

এই আলোচনা হইতে জানিতেছি, দোলাৎসব আদি। পরে ইহার সহিত বসন্ত-প্রবেশজনিত উৎসব ও আরও পরে মদনোৎসব যুক্ত হইয়াছে। দোলের সময় লোহিত ফাগ (ফল্গু) দিয়া শালগ্রামরূপী সবিতার অঙ্গ ভূষিত হয়। ঋগ্‌বেদে সবিতা হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি। তাঁহার রথ হিরণ্ময়। শীতকালে বালরবি লোহিতবর্ণ দেখায়। লোহিত-চূর্ণ দিয়া তাহা জ্ঞাপিত হয়। এইরূপে দোলোৎসব ফল্গূৎসব হইয়াছে। বোধ হয়, পিচকারী দ্বারা লোহিত জল নিক্ষেপ সবিতার হিরণ্য-রশ্মির অনুকরণ।

একদা ঋষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীচ্ছন্দে সবিতার ধ্যান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা-বন্দনায় তাহা আবৃত্তি করিতেছেন। সে কোন্‌ কালের কথা? ধন্য ভারতী! তোমার অতীত বর্তমান আছে।*

---

* ফাল্গুনী পূর্ণিমার বৈদিক প্রমাণ-জিজ্ঞাসু পাঠক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা পড়িতে পারেন।

২

শারদোৎসব

১৩৫৫ বঙ্গাব্দ। শারদোৎসবের শুভ দিবস সমাগতপ্রায়। কিন্তু গ্রাম নিরানন্দ, দেশ অবসন্ন। কে উৎসব করিবে? শূন্যোদরে, ছিন্নবসনে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে উৎসব হয় না।

কবি খেদ করিয়াছিলেন—

> "অনাহারে শীর্ণ রোগে শোকে জীর্ণ,
> বস্ত্রাভাবে লজ্জাহীন,
> দেশের কি দুর্দিন!"

সে দুর্দিনের অবসান এখনও হয় নাই। অচিরে অবসানের আশাও নাই।

পূর্বকালের শারদোৎসব আর আসিবে না। উৎসবের আরম্ভে দেবার্চনা, অন্তে ভূরি-ভোজন। উৎসব আহ্লাদজনক ব্যাপার, কিন্তু সে ব্যাপারের সহিত সংশয় ও উদ্বেগ মিশ্রিত থাকে; কি জানি কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে কি না। ইহাতেই উৎসব এত মধুর হয়। একা একা কিম্বা পরিজন লইয়া হর্ষ প্রকাশে উৎসব হয় না। বহুজনের ক্রিয়া যোগ না হইলে উৎসব হয় না। গ্রামে উৎসবের সকল অঙ্গ বিদ্যমান ছিল। লোকে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত। এখন সে দিন নাই। কিছুকাল তাহার স্মৃতি থাকিবে, পরে তাহাও লুপ্ত হইবে।

দুর্গাপূজায় বহুবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কলিকাতায় সকল দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ভারি সুবিধা। সুবিধা বটে, কিন্তু মাত্র পূজাটি উৎসব নয়। গ্রামে আবশ্যক দ্রব্য অল্পে অল্পে বহুদিনে সংগ্রহ করিতে হয়। উৎসবের কালও দীর্ঘ হয়।

গ্রামের সবাই জানিত, অমুকদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইবে, পূজার নিমন্ত্রণ আসিবে। ইহার অর্থ, প্রতিমা-দর্শনের নয়, প্রতিমা-প্রণামের নিমন্ত্রণ নয়, উৎসবে নিমন্ত্রণ। সে সময় কাহারও কাজকর্ম থাকে না।

যাহাকেই ডাকা হইত, সে-ই আসিয়া কাজ করিয়া দিত। তাহাতে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নাই, বেতনের কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না।

পূজার বিশ-পঁচিশ দিন পূর্ব হইতেই আয়োজন করিতে হইত। গ্রামে জ্বালানি কাঠের অত্যন্ত অভাব। (আমি হুগলী জেলার আরামবাগ লক্ষ্য করিয়া পঁচাত্তর বৎসর পূর্বের বৃত্তান্ত লিখিতেছি।) নিকটে বন ছিল না। নিকটে বন রাখার প্রয়োজন কাহারও মনে উদিত হইত না। কেমন করিয়া সংবৎসর অন্নপাক হয়, তাহা গবেষণার বিষয়। ডালপালা দিয়া নিত্যপাক চলিতে পারে, কিন্তু যজ্ঞের অন্ন পাক চলিতে পারে না। এখানে ওখানে স্বচ্ছন্দ-জাত বাবলাগাছ খুঁজিতে হইত, কখনও বা পুরাতন তেঁতুল ডাল কাটিতে হইত।

তৎকালে সভ্যতার আলোক গ্রামে প্রবেশ করে নাই। চা, বিড়ি, সিগারেট, কেহ এসব নামও শুনে নাই। কিন্তু তামাক অপর্যাপ্ত পুড়িত। হাট হইতে ভাল তামাক পাতা ও তামাকের মসলা আনিয়া চিটাগুড়ের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া তামাক তৈয়ার হইত। সে তামাক গুড়ের নাদায় (গুড়ের পুরু কলসী) পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। বিশ-পঁচিশ দিনে সে তামাকের সুগন্ধ বাহির হইত। মালসায় আগুন থাকিত, আর, যে আসিত, যে কাজের জন্যই হউক, দুই-এক ছিলিম তামাক না পোড়াইয়া যাইত না। কেহ কেহ অপরের হুঁকায় তামাক খাইত না। তাহাদের জন্য হাট হইতে নূতন হুঁকা আনিয়া রাখিতে হইত।

গ্রামের কুমার মাটির যাবতীয় বাসন আনিয়া দিত। সে বাসন অল্প নয়। বড় হাঁড়ি, মাঝারি, ছোট, গুঁড়িহাঁড়ি, তিজেল, জলের কলসী, পূজার ঘট, ভাঁড়, মুড়িভাজা খাপরী ও খোলা, মালসা, সরা, হাতসরা, বুটিসরা, ছোট বড় খুরী, ঢাঁটি, কলিকা, ধুনাচুর, ভাতের ফেনঝাড়া ডাবা, ডাইল রাখা ডাবা।

ডোমনী নূতন ধুচনী, কুলা, চালনী, খইচালনা, চাঙগারি নানা-প্রকারের চুপড়ি ও পেতে, ঝোড়া ও অনেক তালাই (তালপাতার চাটাই) যোগাইত। অনেক তাল-চাটাই দরকার হইত। এক একখানা সাড়ে তিন-হাত, চারি-হাত। দুইখানা তিন দিক সেলাই করিয়া কূর্মপৃষ্ঠ

'ঠেক' করা হইত। ইহাতে মুড়ি মুড়কি রাখা হইত। তাল চাটাইতে ভাত ঢালা হইত। আর, মুচি, ডোম, দুলে, বাগদি প্রভৃতিকে বসিতে দেওয়া হইত।

হাড়িনী খেজুর চাটাই বুনিয়া দিত, ৪ হাত × ২॥ হাত। একজন শুইতে পারিত। সে ঘর হইতে খেজুর পাতা আনিত। পুরাতন শপের ছেঁড়া সারিয়া দিয়া যাইত। শপ বড় বড়, ১৪।১৫ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া।

দেশ ভাত-মুড়ির, অনেক মুড়ি ও মুড়কি করাইতে হইত। সে পাড়ার হরির মা, শারদার খুড়ী, কেনারামের পিসী, ডাকিলেই পাঁচ সাত দিন মুড়ি ও খই ভাজিয়া দিয়া যাইত। মুড়ি ধামায় করিয়া ভাঁড়ারের 'ঠেকে' ঢালা হইত। সকলে ভাল মুড়কি করিতে জানে না। ওপাড়ার গোবর্ধনকে ডাকিলেই সে আসিয়া কড়া-পাক গুড়ের মুড়কি করিয়া দিত। সে মুড়কি গায়ে গায়ে জড়াইয়া যাইত না, অনেক দিন নরমও হইত না। আর এক 'ঠেকে' মুড়কি রাখা হইত। মুড়কিতে গোল মরিচ গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইত। নারিকেল লাড়ুও অনেক করাইতে হইত। সরু কুরণীতে নারিকেল কুরিয়া কড়া-পাক গুড়ের ছোট ছোট লাড়ু প্রস্তুত হইত। কতক লাড়ুতে এলাচ ও কর্পূর গুঁড়া দেওয়া হইত। মুড়ি, মুড়কি ও নারিকেল লাড়ু ইতরভদ্র সকলের পক্ষেই উত্তম জলপান। কেহ লুচিমণ্ডা খুজিত না। ময়রা-ঘর হইতে চিনিতে পাক নারিকেল সন্দেশ, নাম রসকরা, চিনি, বাতাসা ও নবাত আসিত। গ্রামের তৈলকার তৈল যোগাইত। সে তৈল খাঁটি ও টাটকা।

গ্রামের জেলে বড় পুকুরে মাছ ধরিয়া দুই-সেরী আড়াই-সেরী মাছ ছোটপুকুরে আনিয়া ফেলিত। প্রত্যহ বড় জাল ভিজাইত না। একখানা ছোট জাল দিয়া আবশ্যক মাছ ধরিয়া দিত ও তেলজলপান লইয়া ঘর যাইত। মাছ ধরা হইলে বাগদি-বউ মাছ কুটিয়া দিত।

নিকটবর্তী গ্রামের সূত্রধর প্রতিমা নির্মাণ করিত, মালাকার ডাক সাজাইত।

গ্রামের মুচি ঢাক বাজাইত, দূর হইতে কি মধুর শুনাইত! ভোরে বাজিত; বলিত 'উঠ, উঠ, অনেক কাজ আছে, পূর্বদিকে অরুণরাগ দেখা

যাইতেছে।' আরতির বাজনায় অন্তঃকরণ শান্তরসে আপ্লুত হইত। বিসর্জনের বাজনায় চিত্ত বিষাদে ভরিয়া যাইত। সে ঢাক-ই বলিদানের সময় বীর রসে লাফাইতে থাকিত। নিকট গ্রামের ডোম সানাই বাজাইত। সে সানাই কত ছাঁদে কত রাগিণী বাজাইত; কভু ভৈরবী, কভু পূরবী, কভু খাম্বাজ। বধির তাহার কলানৈপুণ্যের কি বুঝিবে? ঢাক ও ঢোল পূজাবাড়ীতে বাজে বটে, কিন্তু দূরের লোক রসভোগ করে।

আটচালার বাহিরে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হইত, অনেক লোক বসিতে পারিত। দুলে-বউ চণ্ডীমণ্ডপ টাটকা গোবর ও নদীর পলিমাটি দিয়া নাতা দিয়াছে, আটচালায় ও চাঁদোয়ার নীচে গোবর--মাটি দিয়া ঝাঁটা দিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে, আটচালায় ও চাঁদোয়া হইতে আম্রপল্লব ঝুলিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের দুই কোণে শিশু কদলী-বৃক্ষ, জলপূর্ণ ঘট, মুখে আম্রপল্লব শোভা পাইতেছে। যে দেখিত, সে-ই বুঝিত উৎসব-ক্ষেত্র।

চাঁড়াল-বউ প্রত্যহ নৈবেদ্যের পানিফল, পূজার পদ্মফুল ও পদ্ম-পাতা আনিয়া দিত। ভাত খাইতে সকলকে কলাপাতা দিতে পারা যাইত না। শালপাতে ডাইল গলিয়া যায়, এইজন্য পদ্মপাতা রাখিতে হইত।

কেহ বিল্বপত্র আনিত, কেহ নৈবেদ্য সাজাইত। গ্রামের মালাকার প্রত্যহ মালা যোগাইত। গ্রামের কামার বলিচ্ছেদ করিত।

পূজার কয়দিন রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই কারণে যাত্রার দল অন্বেষণ করিতে হইত। সে সময় ভাল যাত্রা দুর্লভ, যেমন-তেমন যাত্রাতেই কাজ চলিত। পূজার দুই মাস আড়াই মাস পূর্বে অনেক যাত্রার দলের উৎপত্তি হইত। যাত্রার পালা ও অধিকারী পাইলেই যাত্রার দল গড়িয়া উঠিত। যাহার যাহা বৃত্তি সে তাহা করিত, অধিকারী বাছিয়া বাছিয়া দলে আনিত, জাতি-বিচার ছিল না। তাহারা সন্ধ্যার পর আখড়া দিত, আর ভালমন্দ যাহাই হউক, একটা দল গড়িয়া উঠিত। কৃষ্ণযাত্রা বা সখী-সংবাদ বেশী ছিল। বোষ্টমেরা সেসব যাত্রার দল গড়িত। কিন্তু লোকের রুচি পরিবর্তিত হইতেছিল, শ্রোতা বৃন্দা-দূতীর হাত-নাড়ায় বিরক্ত হইতেছিল। অল্পে অল্পে সখের যাত্রা গড়িয়া

উঠিতেছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে নূতন নূতন পালার যাত্রা প্রচলিত হইতেছিল।

দেবীর সন্ধ্যারতির পর আসন পড়িয়াছে। গালিচায় ব্রাহ্মণেরা বসিবেন, শতরঞ্জিতে অন্য ভদ্রলোকেরা, মাদুর শপে অন্যেরা, খেজুর-শপে আরও অন্যেরা, আর অতি নিম্নশ্রেণীর জন্য তালপাতার চাটাই। কে কোন্ আসনে বসিবে, বলিয়া দিতে হইত না। আটচালায় যাত্রা-সম্প্রদায়ের জন্য খেজুর-শপ পাতা থাকিত। তাহাদের এক এক সম্প্রদায়ে ২৫।৩০ জন থাকিত। গ্রামে কেহ তাহাদের বাসা দিত। সকালে তাহাদের লোক আসিয়া হাঁড়ি, কাঠ, পাত, শপ ও সারাদিনের সিধা লইয়া যাইত। তাহারা গ্রামবাসী, লুচিমণ্ডা খুজিত না। রাত্রি দেড় প্রহরের পর যাত্রা আরম্ভ হইত। তবলা ও বেহালা বাঁধিতে বাঁধিতে অনেক সময় যাইত। তার পর অধিকারী আসিলে যাত্রা সুরু হইত। সে সময়ে এদিকে সেদিকে ঢাক পিটিয়া গ্রামবাসীকে যাত্রা শুনিতে ডাকা হইত। আটজন জুড়ী, আটজন ছোকরা গান করিত। জুড়ী-রা পেণ্টুলেন-চাপকান-চোগা পরিত। পালা অনুসারে ছোকরা-দের বেশ হইত। ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে থাকে, চারিদিক নিস্তব্ধ, বাহিরে অন্ধকার, ভিতরে লণ্ঠনের মৃদু আলো। শীতের আবেশ হইয়াছে, শ্রোতাদের কেহ কেহ ঢুলিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, তাহার মাথা একপাশে হেলিয়া পড়িয়াছে, কেহ উস্-খুস করিতেছে, একটু শুইতে চায়, কেহ কলিকা ফুঁকিতেছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। জুড়ী-রা গান ধরিয়াছে :

"তাই ভাবি গো মনে, বিনে নিমন্তন্নে
কেমন করে' যজ্ঞে যাই বল না।"

এতক্ষণ ডুগি-তবলা নিস্তব্ধ ছিল, এখন মাতিয়া উঠিল। সে মাতন থামিতে না থামিতে—

"তোমরা সভাই যাবে, সমান আদর পাবে,
আমি গেলে পিতে কথা কবেন না।"

কেবা ভাষা দেখে, কিন্তু বিভাষ রাগিণী ঠিক আছে। সময়ের গুণে, শ্রোতার নিদ্রালুভাবের গুণে, আর রাগিণীর গুণে, এই গানই শ্রোতাকে মুগ্ধ করিত। শ্রোতা ক্ষমাশীল, যাত্রার দোষ হইলেও আসর হইতে উঠিয়া যাইত না।

মতি রায় আসিয়া যাত্রায় থিয়েটারী ঢং ঢুকাইয়াছিলেন। জুড়ী তান ধরিয়াছে; এমন সময় দুই-এক ছোকরা নাচিতে আরম্ভ করিত, বিলাতী মেমেদের নাচ। আর, হঠাৎ মেঝেয় শুইয়া পড়িয়া উপরদিকে মুখ রাখিয়া হাত ও পায়ের ভরে শূন্যে থাকিত ও চাকার মত ঘুরিত। ইহা নৃত্য নয়, ব্যায়াম কৌশল। কিন্তু এই চাক-ভঙরি দ্বারা কেমন করিয়া তানের ও গানের গাম্ভীর্য রক্ষা হইত, কে জানে। মতি রায় নূতন সুরে গান বাঁধিয়াছিলেন, সোজা সুর। মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া রাখাল বালকেরা গাহিত—

"ওরে রাম শশী, হবি বনবাসী,
কে আমারে ডাকবে মা বলে'।
ওরে রাম-শশী.."

কিন্তু মতি রায়ের যাত্রা ব্যয়-সাধ্য ছিল। প্রতি রাত্রে ফুরান একশত এক টাকা। অন্য আনুষঙ্গিক খরচও অনেক।

দশমীতে উৎসব সমাপ্ত। সেদিন বিজয়া। সেদিন ব্রাহ্মণ-ভোজন। গ্রাম ছোট হইলে গ্রামের সকল পুরুষই ভোজন করিত। অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন সেই গ্রামেরই লোক। যাহারা পূজায় কিছু কাজ করিত, তাহাদের অধিকাংশ সেই গ্রামের। তাহারা অবশ্য নিমন্ত্রিত হইত। যাহারা অন্য গ্রামের, তাহারাও আসিত। মুচি ও হাড়ী অতিশয় দরিদ্র ও অতিশয় অস্পৃশ্য। সেদিন তাহারাও নিমন্ত্রিত হইত। বিনা নিমন্ত্রণে খাইতে আসিত না। অন্ততঃ সেদিন তাহারা মানুষের মর্যাদা পাইত।

প্রথমে ব্রাহ্মণ-ভোজন। পূর্বরাত্রে লুচি ভাজা হইয়া ঝাঁকায় জাঁকে রাখা হইয়াছিল। মোটা মোটা বড় বড় লুচি, ছয় গণ্ডায় একসের। খাঁটি ঘি, খাঁটি ময়দা। পরদিন মধ্যাহ্নে সে লুচি কোমল, সুঘ্রাণ ও

সুস্বাদু হইত। সেই লুচি ও গুড়-কুমড়ার ছক্কা, এক খামচা শ্যামসাড়া আখের চোখা গুড়, দই ও রসকরা, ইহাই ভোজ্য ছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রথম প্রথম ডাইল খাইতেন না। কিন্তু ছক্কায় ছোলা কলাই থাকিত, ক্রমশঃ ছোলার ডাইল খাইতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণেরা ময়রা-ঘরের মিঠাই ও ঝিলাপী স্পর্শ করিতেন না। পূর্বরাত্রে গোয়ালা হাঁড়া-হাঁড়া দই বসাইয়া রাখিয়াছিল। আহারকালে সে নিজে হাঁড়া হইতে গুঁড়ি হাঁড়িতে দই ঢালিয়া দিত। সে দই গেরি মাটির রং, চাপ-চাপ, অম্ল-মধুর ও সুঘ্রাণ। খাঁটি দুধ, পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধিকি ধিকি জ্বালে সিদ্ধ হইয়া ক্ষীরের মত হইত। গোয়ালা নিজকর্ণে দইএর প্রশংসা শুনিত। সেকালের লোকে ভোক্তা ছিল। যে-কেহ চারি গণ্ডা লুচি খাইত। কেহ কেহ ছয় গণ্ডা লুচি, আধ-গুঁড়ি-হাঁড়ি দই, চারিগণ্ডা সন্দেশ স্বচ্ছন্দে খাইতে পারিত।

ভাতের আয়োজনও এইরূপ অনাড়ম্বর, বাহুল্য-বর্জিত। ভাত, ডাইল, পঞ্চব্যঞ্জন, দই, সন্দেশ পর্যাপ্ত বিবেচিত হইত। পঞ্চব্যঞ্জনের মধ্যে দুইটি নিরামিষ, দুইটি মাছ ও একটি পূর্বদিনের বলিদানের পাঁঠার মাংস থাকিত। সকলেরই মুখ প্রসন্ন। সকলেরই পরিতোষ হইত। দেখিলে মনে হইত, সমুদয় গ্রাম যেন একটি পরিবার। তখন কেহ বুঝিত না, সেদিন বিজয়া-মিলন। তাহারা ভাবিত, সন্ধ্যার পর বিজয়া, দিবাভাগে নয়।

২

কিন্তু সকলে দুর্গাপূজা করিত না, করিতে পারিত না। এখনও করে না, পারে না। তথাপি সকলেই অন্তরে উৎসবের হিল্লোল অনুভব করে। প্রবাসী ঘরে ফিরিবার জন্য ছট্‌ফট করিতে থাকে। চাকর্যে দিন গণিতে থাকে, আর, কি কি জিনিস কিনিতে হইবে তাহার পুনঃ পুনঃ ফর্দ করে। কলেজের ছাত্রেরা গ্রীষ্মে দীর্ঘ অবকাশ পাইয়াছিল, তবু বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হয়। মা ছেলেকে অনেক দিন দেখেন নাই; কবে আসিবে, কবে আসিতে পারিবে, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এই ভাব তখন ছিল, এখনও আছে।

ঘরদ্বার, পথঘাট পরিষ্কৃত হইয়াছে। বাড়ীর উঠানও নিকানো হইয়াছে। কেহ কেহ দ্বারে ও উঠানে আলিপনা করিয়াছে। তৈজস-পাত্র মার্জিত হইয়া ঝক্-ঝক করিতেছে। রন্ধনশালার যাবতীয় হাঁড়ি ফেলা হইয়াছে, নূতন হাঁড়ি কাড়া হইয়াছে। আর, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নূতন কাপড় পরিয়াছে। কন্যা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, জামাই শীঘ্রই আসিবে। প্রত্যেক বাড়ীতেই যেন ছোটখাট উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা করে? কাহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত সাজসজ্জা করে? সে জানে না, কাহার জন্য।

এ কি শরতের আহ্বান? নভোমণ্ডল আ-নীল নির্মল। কদাচিৎ অতি-উচ্চে পাংশুবর্ণ মেঘ কার্পাস তূলার ন্যায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু পবন নাই, অভ্রের সঞ্চরণও নাই। অন্তরীক্ষ রজোনির্মুক্ত। অন্ধকার রাত্রে তারকাসকল হীরকবৎ দীপ্তি পাইতে থাকে। কবির নিকট শরতের চন্দ্র সৌন্দর্যের এক বিখ্যাত উপমা। নদী-জল প্রায় নির্মল হইয়াছে। সরোবরে শ্বেতকমল শোভা পাইতেছে। পথের কর্দম শুকাইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি নীরব, নিস্তব্ধ, শান্ত, স্নিগ্ধ; ইহার উদ্দীপনা নাই।

তবে কাহার আহ্বানে ঘরদ্বার ভূষিত হইয়াছে, আত্মীয়-স্বজন মিলিত হইয়াছে? গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে? সে জানে না, শরৎ ঋতুর; জানে না, নববর্ষের আহ্বান অন্তরে অনুভব করে।

ইহার উৎপত্তি চিন্তা করিতেছি। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। হিম. অর্থাৎ শীত ঋতুতে আরম্ভ, এই কারণে তাঁহারা 'হিম'. শব্দে বৎসর বুঝিতেন। শত হিম. বলিলে শত বৎসর বুঝাইত। খ্রীষ্টান জাতি শীত ঋতু হইতে বৎসর আরম্ভ করে। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ, ২৩শে ডিসেম্বর হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু ভ্রমে ১লা জানুআরি হইতে আরম্ভ করে। এইরূপ, ঋগ্‌বেদের ঋষিগণও হিম ঋতু হইতে বৎসর গণিতেন। কতকাল পরে কে জানে, তাঁহারা শরৎ ঋতু হইতেও আর এক বৎসর গণিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসরের নাম শরৎ। শতং শরদঃ জীবতু, শত শরৎ

বাঁচিয়া থাক, এইরূপ আশীর্বচন ছিল। ইহা অদ্যাপি শুনিতে পাই। আমরা সে দুই বৎসরই গণিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানি না। আমরা ১লা বৈশাখ বৎসর ধরিতেছি, কিন্তু এই রীতি বেশী দিনের নয়। মাত্র ১৬২৯ বৎসর পূর্বে, ২৪১ শকে, ইং ৩১৯ সালে ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়। তখন হইতে আমাদের বর্তমান পাঁজির গণনা চলিতেছে। সে সময়ে চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত ও আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎ, এইরূপ হইত। এখন ঠিক তাহা হয় না। না হইলেও সেই পাঁজি মানিয়াই আমরা চলিতেছি।

সূর্যের উত্তরায়ণ দেখিয়া হিম ঋতুর আরম্ভ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শরৎ ঋতু বুঝিবার কোন উপায় নাই। ঋষিগণ হিম ঋতু হইতে মাস গণিয়া শরৎ ঋতুর আরম্ভ বুঝিতেন। মাস চান্দ্র মাস; পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা, অথবা অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা। কোন নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে আসিতে সূর্যের ৩৬৫ বার উদয় হয়, আরও কিছু সময় লাগে। ভাঙ্গা দিনের পরিবর্তে আর্যেরা বৎসরে ৩৬৬ দিন গণিতেন। সে সময়ে বারটি পূর্ণিমা হইয়া বার দিন বাড়ে। অতএব বার চান্দ্র মাসে বার দিন যোগ করিলে বৎসর পাওয়া যায়। দুই মাসে এক ঋতু। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই চারি ঋতুতে ৮ চান্দ্র মাস ও অতিরিক্ত ৮ দিন (তিথি) অন্তে শরৎ ঋতুর প্রবেশ হয়। ইহার প্রমাণ আছে।

বৈদিক-যজ্ঞের দিন-নির্ণয়ের নিমিত্ত কয়েকটি সূত্র প্রণীত হইয়াছিল। সেসকল সূত্র এখনও আছে, নাম বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। খ্রী-পূ চতুর্দশ শতাব্দে এইসকল সূত্র রচিত হইয়াছিল। তাহাতে আছে, পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ। অতএব তদবধি আট মাস আট তিথি গতে আশ্বিন শুক্লাষ্টমী গতে নবমীতে শরৎ-প্রবেশ হইত। বর্ষা ও শরতের সন্ধিক্ষণেই দুর্গা-পূজার সন্ধিক্ষণ। এই কারণেই দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য। কিন্তু এই গণনা স্থূল; সূক্ষ্ম গণনায় আমাদের বর্তমান পাঁজিতে নবমীতে নয়, দশমীতে শরৎ-প্রবেশ হয় এবং সেই বিধি অনুসারে দশমীতে বিজয়া হয়। সে দিন বিজয়োৎসব। সেই উৎসবের জন্যই, নববৎসরের নবসূর্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই আমরা গৃহদ্বার মার্জিত ও সজ্জিত করি, নিজদেহ নববস্ত্রে শোভিত করি। সুখে দুঃখে এক

বৎসর অতীত হইয়াছে, নব বৎসরে আমাদের বিজয় হউক, আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। এই নিমিত্ত আমরা জগজ্জননীর পূজা করি; আর, গুরুজনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, আত্মীয়-স্বজনের কুশল কামনা করি, তাহাদিগকে লইয়া উত্তম দ্রব্য ভোজন করি। এই বিজয়-কামনা হেতু এই দশমীর নাম বিজয়া-দশমী হইয়াছে। সেদিন আনন্দে কাটিলে সারা বৎসর আনন্দে কাটে।

বঙ্গদেশ, আসাম ও বিহারের কিয়দংশে দুর্গাপূজা হয়। ভারতের অন্যত্র লোকে নবরাত্র ব্রত করে। আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নবরাত্র, নয় দিনের ব্রত। পরদিন দশরাত্রি, সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোকে 'দশরা পরব' বলে (দশহরা নয়)। 'দশরা'তে নববর্ষের প্রথম রবির উদয় হইবে। এইজন্যই উৎসব বা আনন্দ-প্রকাশ।

কাথিয়াবাড় ও গুজরাত প্রদেশের নারীরা এই নবসূর্যের উদয় সম্ভাবনায় হর্ষে নৃত্যগীত করে। সে দেশে পুরনারীর নৃত্য-গীত দূষ্য নয়। তাহারা একটি শতচ্ছিদ্র শ্বেতরঞ্জিত হাঁড়ির মধ্যে প্রজ্বলিত দীপ রাখে ও সেই হাঁড়ি বেষ্টন করিয়া নৃত্য-গীত করে। বর্ষীয়সী নারী সে হাঁড়ি মাথায় লইয়া পাড়ায় পাড়ায় দেখাইয়া ও গান গাহিয়া বেড়ায়। এই নৃত্যগীতের নাম 'গর্বা'। সংস্কৃত 'গর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ মনে করি। ছিদ্রপথে দীপের রশ্মি বহির্গত হয়। হাঁড়িটি সূর্যের প্রতিরূপক, ইহাই গর্ভ। নব রাত্রি গতে এই গর্ভের জন্ম হয়।

কিন্তু লোকে এত কথা জানে না। 'দশ-রা' কেন আনন্দের দিন, তাহারও কারণ পায় না। মনে করে, রামরাবণের যুদ্ধ হইতেছিল, নবমীতে রাবণ রণক্ষেত্রে পতিত হয়, লঙ্কা জয় করিয়া রামচন্দ্র দশমীতে অযোধ্যা-যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়ে আমাদের সকলের বিজয় হয়। নবরাত্র ব্রতের দেশে লোকে রামলীলার অভিনয় করিয়া হর্ষধ্বনি করে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। শরৎকালে রামরাবণের যুদ্ধ হয় নাই, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও হয় নাই। কোন বড় যুদ্ধ শরৎকালে হইত না, হইতে পারিত না। হেমন্ত যুদ্ধের কাল। শরতে যুদ্ধ বাল্মীকির রামায়ণে নাই, ব্যাসের মহাভারতেও নাই।

শারদোৎসব অলপ দিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বৎসর এই উৎসব

চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়, শারদোৎসব; শরৎ-ঋতু প্রবেশ-জনিত উৎসব। কোন্ সময়ে কি আকার ছিল, আমরা জানি না। পূর্বে পূর্বে যে যে দিন শরৎ-প্রবেশ হইত, আমরা অদ্যাপি সে সে দিন পালন করিতেছি, কিন্তু উৎপত্তি ভাবি নাই। এখানে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইতেছি।—

(১) ২৪১ শকের গণিত অনুসারে দশমীতে শরৎ আরম্ভ হইতেছে। ইহার পূর্বকালে এই তিথির পরে হইত। মহাভারত পাঠে জানিতেছি, কুরুকুলপতি মহাত্মা ভীষ্ম মাঘী শুক্লাষ্টমীতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সেদিনকে আমরা ভীষ্মাষ্টমী বলি। পূর্বদিন সপ্তমীতে রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল। মাহেশ্বর যুগ (শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা পশ্য) অনুসারে ইহা খ্রী-পূ ৪৫০ অব্দের ঘটনা। এখানে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা মাস। মাঘী শুক্লসপ্তমী হইতে আট মাস আট দিন গণিলে আশ্বিন-পূর্ণিমা আসে। সেদিন আমরা লক্ষ্মীপূজা করি। রাত্রিকালে লক্ষ্মীর আগমন হইবে, এই আশায় রাত্রি জাগরণ করি। সেদিন দ্যূত-ক্রীড়া করিতে হয় এবং জয় হইলে বুঝিতে হয় সংবৎসর বিজয় হইবে।

(২) আরও প্রাচীনকালে প্রবেশ করি। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে আছে, মাঘকৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরায়ণ হয়। তদনুসারে জানিতেছি, আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে আট মাস ও তদনন্তর আট দিন পরে কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে শরৎ ঋতু আরম্ভ হইত। এইদিন পাঁজিতে দ্যূত-প্রতিপদ নামে খ্যাত। এই নাম হইতেই উৎপত্তি বুঝিতেছি। পূর্বদিন শ্যামাপূজা হইয়াছে। আশ্বিন শুক্লা নবমীতেও অবিকল সেইরূপ দুর্গাপূজা হইয়াছে। দশমী শরৎ বৎসরের প্রথম দিন; সেইরূপ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদ শরৎ বৎসরের প্রথম দিন। গুজরাতে এই শরৎ বৎসর অদ্যাপি চলিতেছে। বণিকেরা সেদিন শুদ্ধাচারে থাকে, আত্মীয়-স্বজনের সহিত উত্তম ভোজন করে এবং বাণিজ্যের নূতন খাতা করে। আশ্বিন অমাবস্যায় যে দীপালী হয়, তাহার সহিত নববর্ষ-উৎসবের সম্বন্ধ নাই। তাহার অন্য কারণ ছিল।

খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে ঋগ্‌বেদের কাল চলিয়াছিল। সে কাল অন্ধকার। কদাচিৎ কোথাও দুই-একটা নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা হিমবর্ষ বা শরৎ-

বর্ষের আরম্ভ ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু অন্য উপায় আছে, সে উপায় সকলেই জানেন।

(৩) লক্ষ লক্ষ পাঠক ভগবদ্‌গীতা পড়িয়াছেন। ভগবান্‌ বলিতেছেন, "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং",—আমি দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ। বঙ্গদেশে আমরা এই মাসকে 'অগ্রহায়ণ' বলি। ইহার অর্থ, যে মাস হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম)। অতএব, মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাস এককালে এক বৎসরের প্রথম মাস গণিত হইত। অতি অল্প পাঠক এই ভগবদুক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করিয়াছেন। অনুধাবন করিলে বুঝিতেন, এখানে আর্যকৃষ্টির এক পুরাতন ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। কদাচিৎ কেহ জানিতে চাহেন, মার্গশীর্ষ কোন্‌ বৎসরের প্রথম মাস ছিল? কত কাল পূর্বে ছিল? দুইটি প্রশ্নই গুরুত্ব-পূর্ণ। আমরা যে শারদোৎসব করি, আমরা তাহার আরম্ভকাল দেখিতে পাইব। আরও দেখিব, আমাদের পূজা-পার্বণে অনেক পুরাতন ইতিহাস নিহিত আছে। আমরা অন্ধ, দেখিতে পাই না। মনে করি, সেসব কু-সংস্কার।

প্রথমে দেখি, মার্গশীর্ষ নাম কেন হইল। চন্দ্র নক্ষত্রপথে গমনাগমন করিতেছে। যে নক্ষত্রে কিম্বা নক্ষত্রের নিকটে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সে নক্ষত্রের নামে সে পূর্ণিমার নাম। মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা নামে এক নক্ষত্র আছে। সেই নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সে পূর্ণিমার নাম মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা। এইরূপ, অপর এগারটি পূর্ণিমার নাম হইয়াছে। যে মাসে মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ। ঋগ্‌বেদের কালে মৃগের শীর্ষ বা শিরে নক্ষত্র না ধরিয়া সমগ্র নক্ষত্রকে 'মৃগ' বলা হইত। ইহা আমাদের পরিচিত কালপুরুষ নক্ষত্র। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে এই নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন দেখিতেছি, পূর্বকালেও তেমন দেখা যাইত। নক্ষত্রের নড়চড় নাই, পূর্ণিমারও নাই। কিন্তু শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্‌গামী হইতেছে। কালিদাসের বিরহী যক্ষ নব জলধরকে দূত করিয়াছিলেন। 'আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে', আষাঢ় মাসের শেষ দিনে, বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা সেদিনকে অম্বুবাচী বলি। কালিদাস ২৪১ শকের গণিত অনুসারে শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাকাল ধরিয়াছেন। এখন

৮ই আষাঢ় অম্বুবাচী হইতেছে। বর্ষাঋতু ২৩ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছায়। মাস যেখানে, সেখানেই থাকে। উত্তরায়ণ পিছায়, সকল ঋতুর আরম্ভ পিছায়।

এখন আমরা উপরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। মার্গশীর্ষ কোন্ বৎসরের প্রথম মাস ছিল? ঋগ্বেদের কালে হিমবর্ষ ও শরৎবর্ষ, এই দুইটি বৎসর ছিল। পরে আর এক বর্ষ, বসন্তবর্ষ গণিত হইতে থাকে। এই তিন বর্ষের কোন্ বর্ষের আরম্ভে সন্ধ্যাকালে মৃগনক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত? বসন্তবর্ষ হইতে পারে না, হিমবর্ষও হইতে পারে না। কারণ, ঋতু পশ্চাদ্গামী, মাস অগ্রগামী হয়। এখনও হিমঋতু পৌষের আরম্ভে আসিতে পারে নাই। অতএব, অগ্রহায়ণ মাস শরৎবর্ষের প্রথম মাস ছিল, এবং দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া শরৎঋতুর প্রথম মাস গণ্য হইত। এক সময়ে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শরৎঋতুর প্রবেশ হইত, এবং আমরা যেমন শরৎ প্রবেশকে বিশেষ দিন ধরিয়া থাকি, সে পূর্ণিমাকেও তৎকালের লোকে সেরূপ বিশেষ দিন গণ্য করিত। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীরা অগ্রহায়ণ মাসে কাত্যায়নীব্রত করিত। কাত্যায়নী দুর্গা। অগ্রহায়ণ মাসে দুর্গাব্রত আকস্মিক নয়।

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শরৎঋতুর আরম্ভ হইলে নিশ্চয় তৎকালে আশ্বিনী পূর্ণিমায় বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইত। আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক, ও কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা, দুইমাস বর্ষাকাল ছিল। অতএব পাইতেছি, আমরা যেদিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করি, সেদিন অম্বুবাচী হইত। আর, এই পুরাতন ইতিহাস লক্ষ্মীর ধ্যানে নিহিত আছে। চারি গজ শুণ্ড দ্বারা চারি ঘট লইয়া লক্ষ্মীর দেহে বারি সেচন করিতেছে। অনেকে অম্বুবাচীর দিন পক্ক অন্ন ভোজন করেন না, ফলমূল খাইয়া থাকেন। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন নারিকেলসহ চিপিটক ভক্ষণ তাহারই অনুকল্প। উপরে দেখিয়াছি, এইদিনে নববর্ষও আরম্ভ হইত। সেই কারণে রাত্রি জাগরণ ও দ্যূত-ক্রীড়া দ্বারা নববর্ষে শুভাশুভ পরীক্ষা করা হয়।

কতকাল পূর্বে আশ্বিন-পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইত, এখন অক্লেশে বলিতে পারি। অশ্বিনীতে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে আশ্বিন-পূর্ণিমা। তখন

এই নক্ষত্রের বিপরীত দিকে চতুর্দশ নক্ষত্রে অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্রে সূর্য থাকেন। অতএব, তৎকালে সূর্য চিত্রা নক্ষত্রে আসিলে অম্বুবাচী হইত। অম্বুবাচীতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। মহাবিষুব হইতে দক্ষিণায়নাদি ৯০ অংশ। অতএব, তৎকালে চিত্রা নক্ষত্র মহাবিষুব হইতে ৯০ অংশ দূরে ছিল। বর্তমানে মহাবিষুব হইতে চিত্রা তারা ২০৩ অংশ দূরে আছে। ইহা হইতে ৯০ অংশ বাদ দিলে ১১৩ অংশ থাকে। ৭৩ বৎসরে অয়ন ১ অংশ পশ্চাদ্‌গামী হইত। অতএব, ১১৩ × ৭৩ = ৮২৪৯ বৎসর পূর্বে চিত্রা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত।

আরও দেখিতেছি, শরৎঋতু আরম্ভের চারিমাস পরে হিমঋতু আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমায় শরৎঋতু আরম্ভ হইলে ইহার চারি-মাস পরে চৈত্র-পূর্ণিমায় হিমঋতুর আরম্ভ হইত। সেদিন রবির উত্তরায়ণ। অতএব, রবি চিত্রা নক্ষত্রে আসিলে দক্ষিণায়ন হইত।

পূর্বে দেখিয়াছি, ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শীত ঋতুর আরম্ভ হইত। দোলযাত্রায় আমরা তাহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। এখানে আরও দুই সহস্র বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ খ্রী-পূ প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতির নিদর্শন পাইতেছি।

ভারতের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রাচীন আর্যগণ ঋতু আরম্ভে যজ্ঞ করিতেন। যাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, তাহাঁরা ঋত্বিক্‌। শারদ যজ্ঞদিনে আমরা এখন দেবীপূজা করিতেছি। তাহাঁরা শরৎপ্রবেশে নিশ্চয় আনন্দ অনুভব করিতেন।

পূর্ব-পিতামহগণের এই পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিলে মন পবিত্র ও উদার হয়; দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষের প্রতি ভক্তি হয়; চিত্ত নির্মল হয়; ঈর্ষা, দ্বেষ, অসত্য, প্রতারণা প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়; এবং আমরা বলি, দেবীর কৃপায় নববর্ষে সকলের বিজয় হউক। স্বস্তি।

৩

রাসযাত্রা

কোন্ দিন বা কোন্ তিথিতে কি করিতে হইবে, কি কৃত্য, তাহা আমাদের পাঁজিতে লেখা থাকে। সকলের পক্ষে সকল কৃত্য নয়, সকলে সকল কৃত্য করেন না। কিন্তু হিন্দুমাত্রেরই কতকগুলি কৃত্য আছে, সেগুলি সাধারণ। একটা প্রশ্ন স্বতঃ মনে আসে, কেন সেদিন সে কৃত্য, কেনই বা সে কৃত্য সেরূপ। কার্য ত দেখিতেছি, হেতু কি? স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ বলেন, এই দিন ইহা করিবে। কিন্তু অন্যদিন না করিয়া কেন সেই দিন, এবং কেনই বা সেই কৃত্য, তাহার উত্তর দেন না। এই কেন-র উত্তর নানা জনের বুদ্ধিতে নানা আকার ধরে। কিন্তু কেন-র কেন খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে বলিতে হয়, জানিনা; অতীত কালে, দূর অতীত কালে, কি ঘটিয়াছিল, তখনকার লোকে কি ভাবিতেন, কে জানে?

তথাপি কৌতূহল থাকিয়া যায়, সদুত্তর পাইবার ইচ্ছা হয়। সদুত্তরও সেটা, যেটায় কৃত্যের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান ও তদনুরূপ কৃত্য বুঝিতে পারা যায়। প্রদেশে প্রদেশে কৃত্যের তিথির এবং কদাচিৎ আকারের ভেদ আছে। এখানে রাস-পূর্ণিমার কৃত্য আলোচনা করিতেছি।

মণ্ডলাকারে নৃত্যের নাম রাস। নরনারীর একত্র মণ্ডলাকারে নৃত্য সাঁওতালদিগের মধ্যে আছে। তাহারা এই প্রকার নৃত্যকে 'কারাম্' বলে। বোধ হয়, পূর্বকালে এই প্রকার নৃত্য গোপগোপীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এক সময়ে রাসপূর্ণিমায় বর্ষ আরম্ভ হইত। রাত্রি দ্বি-প্রহরে রাসোৎসবের কাল।

সূর্যের প্রকাশ দ্বারা দিবা ভাগ হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা এক দিবা হইতে অন্য দিবা পৃথক্ করিতে পারা যায় না। এই হেতু পূর্বকালে রাত্রিদ্বারা দিন গণা হইত। চন্দ্র দেখিয়া চান্দ্র দিন গণনার রীতি হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র সহজে বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু বলা হইত, পূর্ণিমার পর এত রাত্রি গত। আমরা বাংলাদেশে সূর্যের দিন ও মাস

গণিয়া লোক-ব্যবহার করি। কিন্তু, ভারতের অধিকাংশ স্থানে পূর্বকালের রীতি চলিয়া আসিতেছে, লোক-ব্যবহারেও চান্দ্রদিন বা তিথি এবং চান্দ্র-মাস বা 'মাস' চলিতেছে। 'মাস' শব্দের মূলে 'মাস্' অর্থাৎ চন্দ্র। পূর্ণিমার এক নাম পৌর্ণমাসী আছে, অর্থাৎ যে তিথিতে মাস্ (চন্দ্র) পূর্ণ নয়। আমরাও প্রাচীন রীতি ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারি নাই। যখন বলি, আজ মাসের ১০ই, তখন বলি, মাসের দশমী (তিথি)। পনর তিথিতে এক পক্ষ, দুই পক্ষের মধ্যস্থলে পর্ব অর্থাৎ সন্ধিস্থান। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুই পর্ব। অর্ধরাত্রে পর্বসন্ধি।

চন্দ্রের পথ আকাশে যেন বাঁধা আছে, এ নক্ষত্র সে নক্ষত্রের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোনও এক নক্ষত্রের নিকট হইতে গিয়া সে নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে চন্দ্রের ২৮ রাত্রি লাগে। চন্দ্র যেন এক এক রাত্রি এক এক নক্ষত্রের সহিত বাস করেন। কবি দেখিলেন, নক্ষত্রগুলি কন্যা, চন্দ্রের সহিত তাহাদের বিবাহ দিলেন, চন্দ্র তারাপতি হইলেন। যে নক্ষত্রের নিকটে চন্দ্র পূর্ণ হন, সে নক্ষত্রের নামে পূর্ণিমার নাম হইল। কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকট কৃত্তিকা-সম্বন্ধী অর্থাৎ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী, বিশাখার নিকটে বৈশাখী পূর্ণিমা, ইত্যাদি। অক্লেশে নক্ষত্র চিনিবার অভিপ্রায়ে নিকটবর্তী তারা লইয়া এক এক রূপ কল্পিত ও নক্ষত্র-নাম প্রচলিত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্রের নিকটেই পূর্ণিমা হইতে পারে। কোন্ নক্ষত্রে পূর্ণিমাকে 'মাসে'র শেষ বা আরম্ভ ধরা যাইবে? চন্দ্রের ন্যায় সূর্যও নক্ষত্রের পাশ দিয়া গমন করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ছয় মাস দক্ষিণ হইতে উত্তরে, ছয় মাস উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিয়া দুই অয়নে এক বৎসর পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরের চারিটি দিনে বিশেষ আছে। উত্তরায়ণ দিনে দীর্ঘতম রাত্রি, দক্ষিণায়ন দিনে দীর্ঘতম দিবা; দুই বিষুব দিন সম-রাত্রি-দিবা। এই চারির যে-কোনও দিন বৎসর আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। যে দিন বৎসর আরম্ভ, সে দিন মাসেরও আরম্ভ ধরিতে হইবে।

এক নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে রবির ৩৬৬ দিন লাগে। সে সময়ের মধ্যে ১২টি পূর্ণিমা হইয়া আরও ১২ দিন অবশিষ্ট

থাকে। দুই-তিন বৎসরে এক মাস বাড়িয়া যায়। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ এই অধিক মাস ত্যাগ করিতেন। এইরূপে ঋতুর সহিত চান্দ্রমাসের সামঞ্জস্য রাখিয়াছিলেন। মুসলমানী পাঁজিতে অধিক মাস পরিত্যক্ত হয় না। এই কারণে মহরম প্রতি বৎসর এগার দিন করিয়া পিছাইতে থাকে। মহরম বৎসরের প্রথম মাস।

কিন্তু মাস দূরে রাখিয়া ঋতু পিছাইতে লাগিল, দুই সহস্র বৎসরে এক মাস (এক চাঁদ) অগ্রে গিয়া পড়িল। প্রাচীনেরা দেখিলেন, যে যে নক্ষত্রে অয়ন ও বিষুব পূর্বকালে হইত, এইরূপ শ্রুতি বা স্মৃতি ছিল, এখন আর সে নক্ষত্রে ঘটে না। এ কি ব্যাপার! যে-টা ঋত, সে-টা অনৃত হইয়া পড়িতেছে! অকালে যজ্ঞকর্ম ও কৃষিকর্ম করাও চলে না। এই দুশ্চিন্তার অবধি ছিলনা। বেদের ব্রাহ্মণে ও তাহার ছায়া-স্বরূপ পুরাণে নানা অলৌকিক উপাখ্যানে এই আশ্চর্য ব্যাপার লিখিত হইয়াছে। যজুর্বেদের কালে ঋষিগণ ঋতু ধরিয়া বৎসরকে মধু মাধব ইত্যাদি নামে দ্বাদশ ভাগ করিলেন। তদবধি মধু ও মাধব মাসে বসন্ত হইতেছে। এইরূপ অন্যান্য ঋতু।

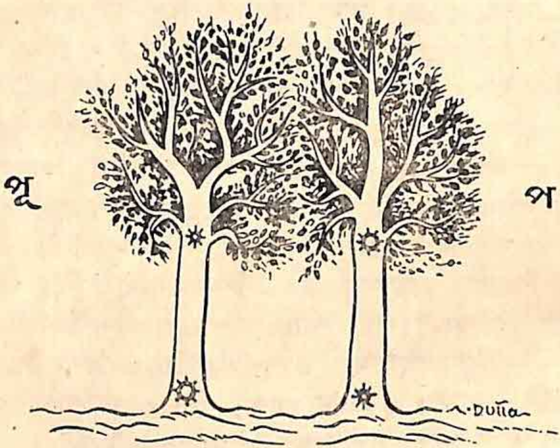
অয়নের পশ্চাৎ চলন হেতু প্রাচীন ঋষিগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যে তাহাঁরা নক্ষত্রে নক্ষত্রে অয়ন বাঁধিয়াছিলেন, তাই আমরা তাহাঁদের কাল নির্দেশ করিতে পারিতেছি। নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, বেদে খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্বের কথা আছে। কারণ, মৃগশিরায় পূর্ণিমা হইত শরৎ ঋতুতে, অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস ছিল, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। লোকমান্য টিলক এই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া অন্য প্রমাণ আছে, আরও পূর্বের কথাও আছে। ঋগ্‌বেদে শরৎ অর্থে বৎসর বুঝাইত; অদ্যাপি সে অর্থ সংস্কৃতে আছে।

কালজ্ঞরা দেখিলেন, কৃত্তিকা ও বিশাখায় বিষুব, মঘায় উত্তরায়ণ। কৃত্তিকায় পূর্ণিমা কার্ত্তিক মাস বৎসরের প্রথম মাস হইল, অপরের নিকট বিশাখায় পূর্ণিমা বৈশাখ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইল। কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুব, বিশাখায় শারদ বিষুব; কৃত্তিকায় পূর্ণিমা হইলে সূর্যকে বিশাখায় থাকিতে হইবে (পরিশিষ্ট পশ্য)। আমরা এখনও বলি, বৎসরের

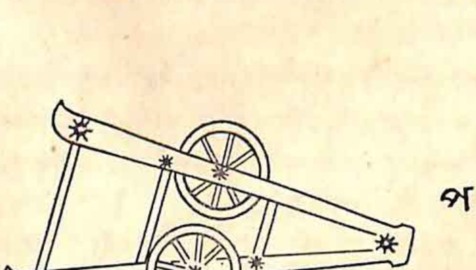
প্রথম মাস বৈশাখ। বহুকাল পর্যন্ত কার্ত্তিকাদি মাস-গণনা ছিল এবং আমাদের পাঁজিতে কার্ত্তিকাদি বর্ষ এখনও লিখিত হইতেছে। মিথিলার লক্ষ্ণাব্দ কার্ত্তিক হইতে গণা হইত। কার্ত্তিক পূর্ণিমাই রাসপূর্ণিমা। এই কালে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, অতএব কৌমুদী। মধ্য রাত্রে রাস; সে সময় নবমাস-ও নববর্ষ-প্রবেশ। সূর্য বিশাখায়। বিশাখা তারার এক প্রাচীন নাম রাধা। রাধা নামের অর্থ লক্ষ্মী। নববর্ষে কে না সৌভাগ্য কামনা করে? বিশাখার রাধা নাম তত চলিত ছিল না, অগ্রহায়ণ নামটিও চলিত ছিল না, এই দুই নাম গুণবাচী ছিল। কিন্তু যজুর্বেদের কালে যখন নক্ষত্রের নাম হইয়াছিল, তখন রাধা নামও হইয়াছিল। নতুবা রাধার অর্থাৎ বিশাখার পরের তারার নাম অনুরাধা হইত না। অথর্ববেদে বিশাখার নাম রাধা আছে। বিশাখার পরে অনুরাধার উদয় হয়, অনুরাধা বিশাখার অনুগমন করে। বিশাখা-নক্ষত্র দুইটি তারা। এই দুই তারা দেখিয়া বিশাখা চেনা সোজা, রাধা নামে চিনিতে পারা যায় না। কার্ত্তিক-পূর্ণিমার রাত্রে সূর্য বিশাখার সহিত মিলিত হন। বৈশাখ মাসের ঋতু-নাম মাধব; রাধা ও মাধবের মিলন হয়। যেদিকে দেখি, সেদিকেই রাধা-কৃষ্ণ আকাশে অগ্রবর্তী হইয়া মণ্ডলাকারে রাস-লীলা করেন। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, তিনি রাস-লীলায় নাই। যাহাঁরা পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সহিত নানাকালে সম্পন্ন সূর্য-লীলা অনুধ্যান করিবেন, তাহাঁরা দেখিবেন, কৃষ্ণের বাল্যলীলা সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব।

পূর্বকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত (দোলযাত্রা পশ্য)। শ্রীকৃষ্ণের কালে আর হইত না। যে ফল্গুনী-নক্ষত্রদ্বয় যুগল-তরুর ন্যায় দেখায় শিশু-কৃষ্ণ সে যমলার্জুন ভাঙিয়া ফেলিলেন (চিত্র ৪)। রোহিণী-নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হইত না। রোহিণী-নক্ষত্র শকটাকার। শিশু-কৃষ্ণ গোপদিগের এই দধি-বহন শকট উল্‌টাইয়া দিলেন (চিত্র ৫)। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম দেখিয়া গোপালগণ আশ্চর্য হইয়াছেন, "দিব্যঞ্চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্"—আপনার কর্ম 'দিব্য', হে তাত, এ সকল কি? আপনার একি বাল-ক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোপকুলে জন্ম! (বিষ্ণুপুরাণ)। শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণকে জানিতে দেন নাই, তিনি কে, এবং

কেনই বা তিনি গো-পাল। সে কথা বেদের ঋষিরা বিলক্ষণ জানিতেন। গো-শব্দের এক অর্থ রশ্মি। বহু পূর্বকালে প্রাচীনেরা মনে করিতেন,



চিত্র ৪। যমলার্জুন (ফল্গুনীদ্বয়)। মে মাসের মাঝামাঝি রাত্রি ৮ টায় মধ্যরেখায় দৃষ্ট হয়। এক মাস আগে রাত্রি ১০টায়, দুই মাস আগে ১২টায়, ইত্যাদি ক্রমে দৃষ্ট হয়



চিত্র ৫। রোহিণী-শকট। জানুআরির শেষে রাত্রি ৮ টায়, এক মাস আগে ১০ টায়, চারি মাস আগে ভোর ৪ টায়, ইত্যাদি ক্রমে মধ্যরেখায় দৃষ্ট হয়

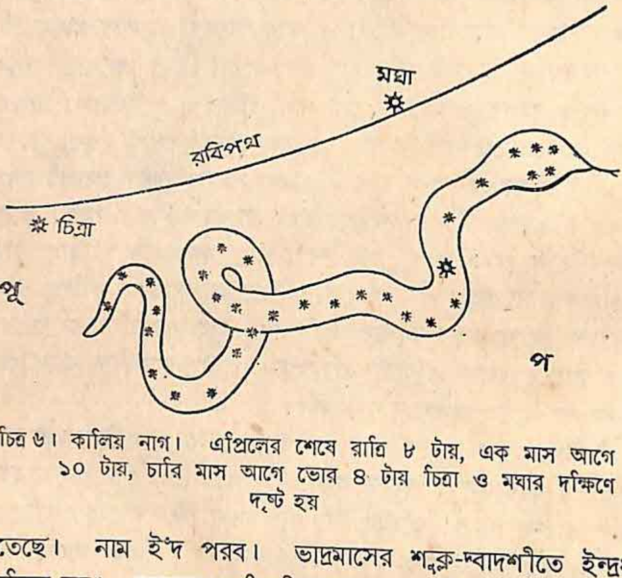
সূর্যের রশ্মিতেই তারাগণের দীপ্তি। তারাগণই গো, সূর্য গোপ, গোপ্তা। এই কারণে তিনি গো-পাল। পুরাণকারও বিলক্ষণ জানিতেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধে লিখিলেন, "মহাত্মা সূর্য-রূপ বিষ্ণু (অচ্যুত ভানু) আবির্ভূত হইলেন।"

যখন কৃষ্ণ বালক, তখন তিনি দেখিলেন, যমুনা নদীর এক হ্রদে এক ভয়ঙ্কর বিষধর নাগ বাস করে। তাহার বিষের জ্বালায় যমুনাতীরস্থ বৃক্ষ সমুদয় জ্বলিয়া গিয়াছিল। একদিন বাল-কৃষ্ণ যমুনাতীরস্থ এক কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে হ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ কালিয় নাগ তাহাঁকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যশোদা, নন্দ ও অপর সমুদয় গোপ-গোপী সেখানে আসিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। বলরাম কৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি কে। তখন কৃষ্ণ স্বীয়-দেহ বন্ধনমুক্ত করিয়া কালিয় নাগের ফণায় আরোহণ পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয় নাগ ও নাগিনীগণ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া সমুদ্রে গমন করিতে বলিলেন। গোপ-গোপীরা হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উপাখ্যানের মূলও ঋগ্‌বেদে আছে। সেখানে ইন্দ্র বৃত্র নামক অহিকে বধ করিতেন। বৎসর বৎসর বধ করিতেন, বৃত্র নিহত হইলে বর্ষাঋতু আরম্ভ হইত। অর্থাৎ, ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনে বৃত্র বধ করিতেন। সেখানে বৃত্রের যেটা পুচ্ছ ছিল, এখানে সেটা কালিয় নাগের ফণা হইয়াছে। অশ্লেষা-নক্ষত্র সেই ফণা (চিত্র ৬)। জ্যোতিষ-গ্রন্থে সূর্যের বার্ষিক ভ্রমণবৃত্তের মেরুর নাম কদম্ব। কৃষ্ণ সে কদম্ব হইতে ঝাঁপ দিয়া সর্পের ফণায় অর্থাৎ অশ্লেষায় পড়িয়া একটি বৃত্তচাপ রচনা করিয়াছিলেন; এই চাপ অয়নাদি বৃত্তের অংশ। তিনি ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। আমরা জানি, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে রবি দোলিত হইয়া থাকেন, সে দোলনই এখানে নৃত্য। কালিয় নাগ আকাশ-সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে, সে আর বর্ষাঋতু আসিবার ব্যাঘাত করে না।

চেদীদেশের এক বিখ্যাত ধর্মিষ্ঠ রাজা উপরিচর-বসু এক দীর্ঘ ধ্বজ উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রধ্বজ-রোপণ নামক এক উৎসব প্রবর্তিত

করিয়াছিলেন। কোন্ দিন রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে, মধ্যাহ্নে ধ্বজের ছায়া দেখিয়া নিরূপিত হইত। অমাত্যাদি সহ রাজা ও প্রজাবর্গ এই উৎসব করিতেন। অদ্যাপি আমাদের অনেক দেশীয় রাজ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে এই উৎসব



চিত্র ৬। কালিয় নাগ। এপ্রিলের শেষে রাত্রি ৮ টায়, এক মাস আগে ১০ টায়, চারি মাস আগে ভোর ৪ টায় চিত্রা ও মঘার দক্ষিণে দৃষ্ট হয়

চলিতেছে। নাম ইঁদ পরব। ভাদ্রমাসের শুক্ল-দ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত হয়। যেকালে রোহিণী-নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব দিন হইত, সে-কালের স্মৃতি আমরা এখন দশহরা কৃত্য দ্বারা রক্ষা করিতেছি। জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-দশমীতে দশহরা। সেদিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। ইহার পূর্বদিন জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-নবমীতে বাসন্ত-বিষুব হইত। বাসন্ত-বিষুবের তিন চান্দ্রমাস ও মাস প্রতি ১ দিন করিয়া ৩ দিন পরে রবির দক্ষিণায়ন। ভাদ্র শুক্ল-দ্বাদশীতে এই দিন হইত এবং সেদিন ইন্দ্রধ্বজ-রোপণ উৎসব হইত। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, সেদিনে আর হয় না, দিন পিছাইয়া গিয়াছে। তিনি ইন্দ্র-পূজা রহিত করিয়া নিজে উপেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন।

এইরূপ, নানাস্থানে পুরাণকার বালকৃষ্ণের কর্মদ্বারা সূর্য-লীলা

বুঝাইয়াছেন। কিন্তু, কবিত্বের এমনই শক্তি, শ্রোতা বুঝিল উপমা। “শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে” বঙ্কিমবাবু আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, করিলে তাহাঁর কর্ম সুচারু সম্পন্ন হইত। তিনি বিশাখা তারার নাম রাধা পাইয়াও রূপকটি ত্যাগ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে রাধা নাম বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা রূপক-ভেদের শঙ্কায় গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, সে প্রাচীন নাম এবং রাধিকার প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী পরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্মৃতি অবশ্য ছিল, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাহার উদ্ধার করিয়া অন্যরূপে প্রকাশ করেন। পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্র ও সূর্য বিপরীত দিকে থাকে। সূর্য বিশাখায়, সুতরাং চন্দ্র কৃত্তিকায়। অতএব চন্দ্রের আলী (সখী) কৃত্তিকা এবং সূর্যের সখী বিশাখা, পরস্পর প্রতিকূলই বটে। বোধ হয়, আলী আবলী হইয়া চন্দ্রাবলী নাম হইয়াছে।

কৃষ্ণের এইরূপ লীলা আকাশের সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব বলার এমন তাৎপর্য নয় যে, মহাভারতের দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি মনঃকল্পিত। তাহাঁর বাল্য ও কৈশোর কাল জানা ছিল না, তাহাঁর সময়ে বর্তমান মহাভারত বা পুরাণ রচিত হয় নাই। বহুকাল পরে যখন প্রণীত হইল, তখন তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার। ভানুচরিত্র তাহাঁতে আরোপ করিয়া ভক্তেরা নভোমণ্ডলে তাহাঁরই লীলা দেখিতে লাগিলেন।

এসব কাহিনী থাক। কার্ত্তিক পূর্ণিমার কৃত্য অনুসরণ করি। খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদের কালে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শারদ-বিষুব ও বৈশাখী-পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব হইত। তাহারই স্মৃতি রাসযাত্রার মূল হইয়াছে। এতকাল যে রাসোৎসব চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে। নববর্ষে বিষুব দিনে যজ্ঞ করা হইত, এবং যজ্ঞ যাহাই হউক, এক মহোৎসব। পরবর্তীকালে পুরাতন স্মৃতি রাসের আকার পাইয়াছিল। বৎসরান্তে পিতৃগণের নাম-স্মরণ বিহিত ছিল। শ্রাদ্ধে দীপদানও বিহিত। এখন শ্রাদ্ধ করা হয় না, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দীপ দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্গেও পূর্ণিমার পূর্বরাত্রি বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে ৩×১০৮টি দীপ দিবার বিধি আছে। দীপালীতে যেমন দুইটা ঘটনা মিশিয়া গিয়াছে, এখানেও তেমন হইয়াছে।

এখন এই কাহিনী শেষ করি। "দোলযাত্রা" প্রবন্ধে দেখিয়াছি, ছয় হাজার বৎসর পূর্বের স্মৃতি তাহাতে জড়াইয়া আছে। পাঠক দেখিবেন, যে ধারা ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতখণ্ডে প্রবাহিত ছিল, তাহা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইলেও কালে কালে নব নব রসযোগে নানা ছন্দে আমাদিগকে অদ্যাপি জীবন দান করিতেছে। কত কালের কত কথা কতরূপে পুরাণে ও ধর্মকৃত্যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন আমরা আমাদের পূর্ব-পিতামহগণের পদতলে বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছি। আমাদের তুল্য ভাগ্যবান্ নপ্তা কে আছে?

৪

শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা

সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে আমরা পাঠশালায় প্রতি মাসে শুক্ল-পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতাম। একখানা ধোআ চৌকীর উপরে তালপাতার তাড়ী দোয়াতকলম রাখিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু ইস্কুলে সরস্বতী পূজা হইত না। আমরা শ্রীপঞ্চমীতে বাড়ীতে বই শ্লেট দোয়াত কলমে পূজা করিতাম। সে বই বাংলা কিম্বা সংস্কৃত, ইংরেজী হইতে পারিত না। ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা। গ্রামে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে। নগরে কদাচিৎ কোন ধনাঢ্য সরস্বতী-প্রতিমা পূজা করিতেন। বর্ধমানে মহারাজার সরস্বতী-প্রতিমা-পূজায় মহা-সমারোহ হইত। পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর হইতে শত শত লোক ভাসান দেখিতে আসিত। দুই ঘণ্টা যাবৎ নানা বিচিত্র আতসবাজি পুড়িত।

গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে নগরে নগরে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, ইস্কুলে কলেজে সরস্বতীর প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিজের বাড়ীতেও প্রতিমা-পূজা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র বাঁকুড়া নগরেও বাজারে অসংখ্য সরস্বতী-প্রতিমা বিক্রয় হইয়া থাকে। ছাত্রদিগের সারস্বতোৎসবে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমি বর্ষে বর্ষে খানকয়েক নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া থাকি। টোলের বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ছন্দে পত্র লিখে। ইস্কুলের ছাত্রেরা সাধু বাংলা ভাষায় লিখে, বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অধিক বয়সের ছাত্রেরা, কলেজের ছাত্রেরা, সোজা ভাষায় লিখিতে পারে না, বাক্-বিদগ্ধতা প্রকাশ করে। কারণ তাহারা "ক্লাসিকাল বেঙ্গলি" পড়ে, যাহার বাংলা অনুবাদ শুনি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লৈখিক ভাষা ও মৌখিক ভাষা তুল্য-মূল্য বিবেচনা করেন। যে যাহা বলে তাহাই বাংলা ভাষা। যাহার কলমে যেমন আসে তাহাই বাংলা বানান। প্রথমে অর্থবোধ, পরে পাঠ করিতে হয়। গত সরস্বতী-পূজার আট নিমন্ত্রণের মধ্যে একখানি দুইখানি তিনখানি পত্রে লিখিত ছিল, অমুক দিন বৈকালে "প্রতিমা-নিরঞ্জন" হইবে। 'প্রতিমা-নিরঞ্জন'? কি

কর্ম, বুঝিতে পারিলাম না। নিরঞ্জন অঞ্জনশূন্য নির্মল; ইহা হইতে পরব্রহ্ম। শূন্য ধর্মরাজ নিরাকার নিরঞ্জন। প্রাচীন বাঙ্গালী কবির প্রয়োগে দেখিতে পাই। নিমন্ত্রণ-পত্রের ভাবে বুঝিলাম 'প্রতিমা-নিরঞ্জন' প্রতিমা-বিসর্জন। বিসর্জন কর্ম বুঝাইতে নিরঞ্জন শব্দের প্রয়োগ পূর্বে পড়ি নাই, শুনি নাই, সংস্কৃত কোষেও নাই। কলেজের ছাত্রেরা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ে। তাহারা বিসর্জন অর্থে নিরঞ্জন শব্দ কোথায় পাইল?

পাড়ার এক উৎসবক্ষেত্রে যাইয়া দেখি সরস্বতী গিরিকুঞ্জবাসিনী পদ্মাসনা দ্বিভুজা বীণাধারিণী, অঙ্গে বাহুমূল পর্যন্ত রক্তবর্ণ আচ্ছাদন, তদুপরি নীলাম্বরী। "অহে, এ কি করিয়াছ? গিরিতে পদ্ম ফোটে না। যিনি শুভ্রা যাহাঁর আসন বসন পুষ্প শুভ্র, তাহাঁর অঙ্গে রক্ত ও নীল বস্ত্র কেন?" "এরূপ না করিলে শ্বেত প্রতিমা মানায় না।"

একটু দূরে কলেজের ছাত্রদের উৎসবক্ষেত্রে গিয়া দেখি, সরস্বতী এক নিকুঞ্জে পদ্মাসনা, দ্বিভুজা বীণাধারিণী। সম্মুখে দুইটি হাঁসও আছে। "অহে, তোমাদের গণ-পতি কে? সরস্বতীর হাতে পুথী কই? আর, 'প্রতিমা-নিরঞ্জন' কি কর্ম?" "আমরা সরস্বতী বিসর্জন করিতে পারি না, কাজেই নিরঞ্জন লিখিয়াছি।" "তোমরা কেন, মূক ও উন্মত্ত ব্যতীত কেহই পারে না। তোমরা যে মৃণ্ময়ী প্রতিমা সর্জন করিয়াছ, সেই সৃষ্ট প্রতিমূর্তির বিসর্জন করিবার কথা। ত্যাগ অর্থে নিরঞ্জন শব্দ কোথায় পাইলে?" অনুসন্ধানে জানিলাম শব্দটি হাওড়া জেলায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিল। পূর্ব-বঙ্গে পূজা ও বিসর্জন অন্তে প্রতিমা জলে নিক্ষিপ্ত হয় না, গৃহে রক্ষিত হয়। বৎসরান্তে নূতন প্রতিমা হইলে পুরাতন প্রতিমার নিমজ্জন হয়। পণ্ডিতমানীরা বিসর্জন কিম্বা ভাসান না বলিয়া "নিরঞ্জন" বলেন।

শব্দটি কোথা হইতে আসিল? রূপে সংস্কৃত কিন্তু প্রযুক্ত অর্থে নয়। অনেক দিনের কথা, এক কবিরাজের বিজ্ঞাপনে "দন্তমঞ্জন-চূর্ণ" এই নাম পড়িয়াছিলাম। আমরা বলি দাঁতের মাঁজন, সংস্কৃতে দন্ত-মার্জন। মাঁজন শব্দ কবির কলমে মঞ্জন হইয়াছে। "আমাশয়" নামে আর এক উদাহরণ আছে। আমরা বলি আমাসা, সংস্কৃত নাম আমাতিসার।

আমাসা রোগ আমাশয় হইয়াছে। সংস্কৃত নীরাজন শব্দ কি নিরঞ্জন হইয়াছে? নীরাজন শব্দের দুই অর্থ আছে। (১) এক প্রকার আরতি। দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ কর্পূর বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা যে আরতি হয় তাহা নীরাজন। (২) বিজয়া দশমীর প্রাতঃকালে যুদ্ধাস্ত্রের ও অশ্বের পূজা নীরাজন। ইহা এক বৃহৎ ব্যাপার। দেশীয় রাজ্যে অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেদিন দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়। হয়ত একই দিনের দুই কৃত্য দেখিয়া নীরাজন শব্দের অর্থ বিসর্জন, পরে অপভ্রংশে নিরঞ্জন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অথবা নীরে জলে অজনম্ ক্ষেপণম্ নীরাজনম্, তাহা হইতে নিরঞ্জন। কিন্তু ইহাতে 'অঞ্জন' পাইতেছি না। বৈয়াকরণ বলিতে পারেন নীরে জলে অঞ্জনম্ গমনম্ নীরাঞ্জনম্। কিন্তু স্মৃতি গ্রন্থে নিমজ্জন অর্থে নীরাঞ্জন শব্দের প্রয়োগ পাই নাই। বোধ হয় তৃতীয় অর্থের নীরাজন শব্দ ভ্রমক্রমে নিরঞ্জন হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে মহাভারত ও পুরাণ বঙ্গবাসী সংস্করণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন পুরাণ-রচনার যে দেশ ও কাল লিখিত হইল, তাহা আমার অনুমান। কোন কোন বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল।

সরস্বতীর প্রতিমা

দেবী সরস্বতী এক শক্তি। সকল দেবদেবীই এক এক শক্তি। শক্তি নিরাকার। নিরাকারের আকার-কল্পনা হইতে পারে না। নিষ্ক্রিয় শক্তির সত্তা অনুভূত হয় না। তাহার ধ্যান ও ধারণা আমাদের অগম্য। শক্তি সক্রিয় হইলে আমরা কর্ম দেখিয়া তাহার সত্তা অনুভব করি। বাক্য দ্বারা সে কর্ম বর্ণনা করিতে পারি। সে বর্ণনা শক্তির বাঙ্ময়ী প্রতিমা। শব্দজ্ঞানহীন চঞ্চলচিত্ত অল্পমতির নিকটে বাঙ্ময়ী প্রতিমা পরিস্ফুট হয় না। তাহাদের নিমিত্ত জড়ময়ী প্রতিমার প্রয়োজন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা শিলা ধাতু দারু ও চিত্র, এই বিবিধ উপায়ে জড়ময়ী প্রতিমা রচিত হয়। প্রতিমা মূর্তি নয়, প্রতিমূর্তি। কথাটা আর কিছু নয়, ভাষা দ্বারা ধারণা করিবে, না চিত্র দ্বারা করিবে? ছাত্রেরা জানে, যখন ভাষায় কুলায় না,

চিত্র স্পষ্ট করে। এমন নির্বোধও কেহ নাই যে প্রতিকৃতি সত্য মনে করে।

যে যে করণ দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়, এক বা অধিক সে সে করণের বিনিবেশ দ্বারা সে কর্ম ব্যঞ্জিত হয়। যেমন, কাহারও হাতে কাগজ কলম দেখিলে বুঝি সে লেখাপড়া করে। কাগজ কলম তাহার লেখাপড়ার চিহ্ন। সরস্বতী বিদ্যা-বুদ্ধি-স্মৃতি-জ্ঞান-শক্তি, প্রতিভা-কল্পনা-শক্তি, সংখ্যা-কর্তৃত্ব-শক্তি। অতএব পুস্তক সরস্বতী প্রতিমার প্রতীক, অক্ষমালা সংখ্যাকরণের প্রতীক। প্রতীক অবয়ব।

পুরাণকার দেবদেবী সম্বন্ধে নানাবিধ উপাখ্যান রচনা করিতে পারেন। কাহারও প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রতিমা-কল্পনায় গুরুপরম্পরা মানিয়া চলিতেন। আর, যিনি কল্পনার গুরু, তিনি ধ্যানমন্ত্রে প্রতিমার মূল ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। ধ্যানমন্ত্র, বাঙ্‌ময়ী প্রতিমা। শিল্পী সে মন্ত্রের চাক্ষুষ রূপ নির্মাণ করেন। কালে কালে দেশে দেশে প্রতিমার বেশ ও ভূষণের প্রভেদ হইতে পারে, কিন্তু আভরণ দ্বারা যে মূলভাব ব্যঞ্জিত হয়, তাহার অন্যথা হইতে পারে না। রাম তিন। হাতে ধনুর্বাণ দেখিলে বুঝি, তিনি দশরথ-পুত্র রাম; পরশু দেখিলে বুঝি তিনি জমদগ্নি-পুত্র রাম; লাঙগলাকার অস্ত্র দেখিলে বুঝি তিনি বসুদেব-পুত্র রাম। এইরূপ নারীমূর্তির হস্তে পুস্তক দেখিলে বুঝি তিনি সরস্বতীর প্রতিমা। কারণ, বীণাহস্তা নারী অপ্সরা হইতে পারে। অপ্সরা জলকেলি করে, পদ্মে বসিতে পারে।

এখন দেখি, প্রাচীনেরা সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে তাহাঁর কি প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিলেন। সাড়ে-তিন শত বৎসর পূর্বে রাঢ়ের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহাঁর চণ্ডীকাব্যে সরস্বতী বন্দনায় লিখিয়াছিলেন, 'শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেত বস্ত্র পরিধান,' 'শিরে শোভে ইন্দুকলা, করে শোভে জপমালা, শুকশিশু শোভে বাম করে।' তাহাঁর আর এক করে পুস্তক। মসীপাত্র ও লেখনী তাহাঁর সঙগী। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, বেণুবীণা, নানা বাদ্যযন্ত্র নিরন্তর তাহাঁর সেবা করে। তিনি বিধিমুখে বেদধ্বনি, বীণাপাণি, বর্ণময়ী, বিষ্ণুমায়া। দেখা যাইতেছে, কবিকঙ্কণের সরস্বতী

চতুর্ভুজা, দক্ষিণ-করে পুস্তক ও মসীপাত্র, বাম-করে জপমালা ও শুক-শিশু। শুক শিশু লীলাশুক।*

বিষ্ণুমায়া আদ্যা প্রকৃতি। লীলাশুক দ্বারা প্রকৃতির লীলা বুঝাইতেছে। দুর্গা মহামায়া মহাশক্তি, সরস্বতী সে শক্তির একাংশ। শিরে শোভে ইন্দুকলা। বোধ হয় শুক্ল-পঞ্চমীর কলা, সরস্বতী-প্রতিমার মুকুটের লক্ষণ।

কবিকঙ্কণের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দের মধ্য ভাগে নবদ্বীপে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শারদাতিলক নামক তন্ত্র হইতে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্তমান সরস্বতী পূজায় সেই "তরুণ-শকল-মিন্দোর" ইত্যাদি ধ্যানমন্ত্র বঙ্গদেশের সর্বত্র বিদ্যার্থীরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সরস্বতী শুভ্রকান্তি, শ্বেতপদ্মে আসীনা, করে লেখনী ও পুস্তক, শিরে তরুণ ইন্দু। এখানে সরস্বতী দ্বিভুজা, কিন্তু বীণাহস্তা নহেন। অতএব ধ্যানের সহিত বর্তমান কালের প্রতিমার ঐক্য হইতেছে না। স্মার্তমহাশয় ঘটস্থিত জলে বা শালগ্রামে সরস্বতীর পূজা করিতে বলিয়াছেন, প্রতিমায় বলেন নাই। মনে রাখিতে হইবে, তিনিই আমাদের ধর্ম-কর্ম আচার-ব্যবহার শাসন করিতেছেন।

রঘুনন্দনের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে বৃহদ্ধর্মপুরাণ নামে একখানি উপপুরাণ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে (২৫।৩৯) সরস্বতী শুক্লবর্ণা ত্রিনেত্রা, শিরে চন্দ্রকলা, হস্তে সুধা বিদ্যা মুদ্রা ও অক্ষমালা।

কালিকা-পুরাণ এক বিখ্যাত উপপুরাণ। আসামে অষ্টম হইতে দশম খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে (৭৫ অঃ) সরস্বতী বীণাপুস্তকধারিণী, মালাকমণ্ডলুহস্তা। অথবা বরদ-অভয়হস্তা, মালা-পুস্তকধারিণী। (কমণ্ডলু সুধাপূর্ণ)।

---

* লীলাশুক, লীলামৃগ, লীলাকমল প্রসিদ্ধ ছিল। আমি পুরীতে জগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রার সময়ে কোন কোন পাণ্ডার হাতে শুকপক্ষী, কাহারও স্কন্ধে মর্কট-শিশু দেখিয়াছি।

নবম খ্রীষ্ট শতাব্দে, বোধ হয় মধ্য প্রদেশে, অগ্নিপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে (৫০ অঃ) "পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতী"। এখানে সরস্বতী চতুর্ভুজা, হস্তে পুস্তক অক্ষমালা ও বীণা। বীরভূম নানুরে এইরূপ এক পাষাণ-প্রতিমা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মৃত্তিকা হইতে আবিষ্কৃত হইয়া বিশালাক্ষী নামে পূজিতা হইতেছেন। (কিন্তু তন্ত্রমতে বিশালাক্ষী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভুজা খড়্গ-খেটকধারিণী ও শবাসনা।) প্রাজ্ঞেরা বীরভূম নানুরের সরস্বতী-প্রতিমা অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দের মনে করেন। এইরূপ সরস্বতী-প্রতিমা বঙ্গের অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকার চিত্রশালায় একটি আছে।

তান্ত্রিক সাধকেরা বাগীশ্বরীর পূজা করিতেন। নানা তন্ত্রে নানা ধ্যান রচনা করিয়াছিলেন। যথা, অগ্নিপুরাণে (৩১৯ অঃ) বাগীশ্বরীর ধ্যানে তিনি চতুর্ভুজা ত্রিলোচনা। এক হস্তে পুস্তক, অন্য হস্তে অক্ষসূত্র, অপর দুই হস্ত বরদ ও অভয়। লিখিত আছে, বাগীশ্বরীর পূজা করিলে লোকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবি এবং কাব্যশাস্ত্রাদিবিৎ হয়। (সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার কবি)।

বঙ্গদেশের কৃষ্ণানন্দের বৃহৎতন্ত্রসারে বাগীশ্বরীর পাঁচটি ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, (১) রঘুনন্দনোদ্ধৃত শারদাতিলকের ধ্যান। (২) শুভ্রা কমলাসনা ত্রিনয়না শিরে ইন্দুকলা, হস্তে ব্যাখ্যা অক্ষসূত্র সুধাকলস ও বিদ্যা। (৩) শুভ্রা হংসারূঢ়া, মস্তকে অর্ধচন্দ্র, হস্তে বীণা অক্ষসূত্র সুধাকলস ও বিদ্যা। (এখানে দ্রষ্টব্য, সরস্বতী হংসা-রূঢ়া, তাহাঁর মস্তকে অর্ধচন্দ্র। এই দুই নূতন কল্পনা অন্য ধ্যানে নাই)। (৪) শুভ্রা, পদ্মাসনা, বাহুতে জপবটী পুস্তক ও পদ্মদ্বয়। (৫) শুভ্রা, শিরে শশিকলা, বাহুতে ব্যাখ্যা পুস্তক বর্ণমালা ও সুধা-কলস। বাগীশ্বরীর কোন কোন মন্ত্রে তিনি বহ্নিবল্লভা। ইহা স্মরণীয়।

পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দের অন্তকালে উজ্জয়িনীতে বরাহ-মিহির তাহাঁর বৃহৎ-সংহিতায় প্রতিমালক্ষণ লিখিয়াছিলেন। তিনি সরস্বতী-প্রতিমার উল্লেখ করেন নাই।

মৎস্যপুরাণের দুই অধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ আছে। তাহাতে লক্ষ্মীর আছে, সরস্বতীর নাই। মূল মৎস্যপুরাণ বহু প্রাচীন। বোধ হয়

মহারাষ্ট্র দেশে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত প্রতিমা-লক্ষণ চতুর্থ খ্রীষ্ট শতাব্দের মনে করা যাইতে পারে।

মগধে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দে কৌটিল্য "অর্থশাস্ত্র" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে (২।৪) তিনি পুরমধ্যভাগে দেবগৃহ নির্মাণ করিতে বলিয়াছেন। শিব, কুবের, অশ্বিনীকুমার, লক্ষ্মী, আরও কয়েকটি অজ্ঞাত দেবের নাম করিয়াছেন। পুরের চতুর্দ্বারে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও কার্ত্তিকের মন্দির করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সরস্বতীর উল্লেখ করেন নাই।

উপরি-উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয়, (১) ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দের পরে সরস্বতীর প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে। ইহার বহুকাল পূর্বে লক্ষ্মী-প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল। পরে দেখা যাইবে, আদিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই শক্তি বিবেচিত হইতেন। (২) দ্বিভুজা বীণা-পাণি সরস্বতী কোন ধ্যানে পাওয়া গেল না। সংস্কৃত কোষে সরস্বতীর নাম বীণাপাণি নাই। অতএব মনে হয় চতুর্ভুজাকে দ্বিভুজা করা হইয়াছে। দ্বিভুজা বীণাপাণি সরস্বতী-প্রতিমা গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গন্ধর্ব-বিদ্যা অভ্যাস করে না। তাহারা কাহার উপাসনা করে?

শ্রীপঞ্চমী

মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা হইয়া থাকে। (চান্দ্র মাঘ মাস, 'মাস' শব্দে চান্দ্রমাস বুঝিতে হইবে)। এই পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু "শ্রী" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। অমরকোষে "শ্রী" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী আছে, সরস্বতী নাই। অমরকোষ তৃতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দে বর্তমান উত্তরপ্রদেশে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে মহাভারতে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী-পঞ্চমী। এ বিষয় পরে চিন্তা করা যাইবে।

নারী ষট্‌পঞ্চমী ব্রত করিয়া থাকেন। মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসর প্রতি মাসে শুক্ল পঞ্চমীতে লক্ষ্মী-মাধবের পূজা করেন। মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতেই ছয় বৎসর পূর্ণ হয়। এই ব্রতের ফলে নারী লক্ষ্মীসমা হন। ব্রহ্মপুরাণ (৩৩৭ অঃ) বলেন, লক্ষ্মীর কৃপা হইলে

সকল সম্পদ্ লাভ হয়, বিদ্যালাভও হয়। লক্ষ্মী ব্রহ্মশ্রী, যজ্ঞশ্রী, ধনশ্রী, যশঃশ্রী, বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী ইত্যাদি চরাচরে যাহা কিছু আছে, সবই লক্ষ্মীর দ্বারা ব্যাপ্ত।

মৎস্যপুরাণে সারস্বতব্রত নামে এক ব্রতের বিধি লিখিত আছে। ত্রয়োদশ মাস শুক্ল ও কৃষ্ণ পঞ্চমীতে সারস্বত ব্রত করিবার বিধি ছিল। সে ব্রত করিলে মধুরবাণী, জনসৌভাগ্য, স্মৃতি, বিদ্যায় কৌশল, দম্পতির ও বন্ধু জনের অভেদ ও দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ হয়। বীণা-অক্ষমালাধারিণী কমণ্ডলু-পুস্তক-হস্তা গায়ত্রীর অর্চনা করিতে হইবে। সরস্বতীর অষ্ট তনু আছে। যথা, লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা, ধৃতি। এখানে সরস্বতীর প্রাধান্য হইয়াছে। সরস্বতী গায়ত্রী ও কৃষ্ণ পঞ্চমীতেও অর্চনীয়া হইয়াছেন। বোধ হয় যে বৎসর এক (চান্দ্র) মাস বৃদ্ধি হয়, সে বৎসর উক্ত ব্রতের বৎসর ছিল। ত্রয়োদশ মাসে ব্রত পূর্ণ হইবার হেতু এই।

কালিকাপুরাণের দুই স্থানে দুই মত আছে। যথা, মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে শিবা (দুর্গা) পূজা করিবে। শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করিবে। (কালিকাপুরাণ এককালে রচিত নয়)।

স্মার্ত রঘুনন্দন "সম্বৎসর প্রদীপ" হইতে তুলিয়াছেন, "পঞ্চম্যাং পূজয়েৎ লক্ষ্মীং মস্যাধারং লেখনীঞ্চ।" পঞ্চমীতে লক্ষ্মী মস্যাধার আর লেখনীর পূজা করিবে। ["সম্বৎসর প্রদীপ" বঙ্গদেশীয় হলায়ুধ-কৃত একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের]।

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজাই বিহিত ছিল। কখন কখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই বিবেচিত হইতেন। পরে দুই শক্তি পৃথক্ ভাবিয়া প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে সরস্বতী পূজা বিহিত হইয়াছে। পাঁজিতেও লিখিত আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা। কেবল সরস্বতী পূজা নয়।

মাঘশুক্ল পঞ্চমীতে পূজা কেন

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, এই তিন, আমাদের ধর্মকৃত্যের নিয়ামক। শ্রুতি—বেদ; স্মৃতি—স্মরণ; পূর্বকালের ধর্মকৃত্যের ব্যবস্থা-স্মরণ। পূর্বকালে বৎসরের কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে কি কৃত্য

ছিল, কি অনুষ্ঠান হইত, তাহার স্মরণ। পূর্বকালে যেমন হইত এখনও তেমন হইবে, স্মৃতিপরম্পরা ভঙ্গ হইবে না। পুরাণে পূর্বকালের ঐতিহ্য লিখিত হইয়াছে। এই হেতু স্মার্তেরা দেবদেবীর পূজা-বিষয়ে পুরাণ আশ্রয় করিয়াছেন।

তাহাঁরা দেবদেবীর পূজার দিন নির্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই দিন নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। নচেৎ ক্রিয়া-সম্পাদনের সুবিধা হয় না। সমাজের সকলে একই দিনে সে ক্রিয়া করিতে পারে না। এখানে সে কথা নয়। প্রশ্ন এই, অন্য তিথিতে সরস্বতী-পূজা বিহিত হয় নাই কেন? প্রত্যেক পূজার দিন সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয়।

বেদই হউক, স্মৃতিই হউক, পুরাণই হউক, হেতু বিনা ধর্মকৃত্যের দিন নির্ধারিত হয় নাই। আমরা সে হেতু জানি না। জানি না বটে, কিন্তু বুঝি কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। এক বিদ্বান্ বলিলেন, "আজ সারস্বত যজ্ঞ করা হউক," "এস আজ দুর্গাপূজা করি"। সকলে তাহাঁর ইচ্ছা মানিবে না, যজ্ঞ করিবে না, পূজা করিবে না। "আজ কি যে সে যজ্ঞ করিব, দুর্গাপূজা করিব?" এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে সে সে দিন নির্দিষ্ট হইতে পারিত না। বেদের কালে নয়, পুরাণের কালেও নয়।

অনুধাবন করিলে কতকগুলি দিন-ব্যবস্থার হেতু পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট বৎসরের সকল দিন সমান। কিন্তু যাহাঁরা শুভ কর্মের নিমিত্ত, উৎসবের নিমিত্ত দিন অন্বেষণ করেন তাহাঁদের নিকট সকল দিন সমান নয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুইটি বিশেষ দিন সহজে লক্ষিত হয়। কেহ অমাবস্যা হইতে কেহ পূর্ণিমা হইতে মাস গণনা করিতেন। বৎসরের মধ্যে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুভেদ সহজে লক্ষিত হয়। ঋতুর আরম্ভ না জানিলে কৃষিকর্ম অসম্ভব। কেহ শীত ঋতু, কেহ বর্ষা ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ বসন্ত হইতে বৎসর গণিতেন। এই হেতু বিষুব দিনদ্বয়, অয়নাদি দিনদ্বয় এবং ঋতুর আরম্ভ দিবস স্মরণীয় হইয়াছিল। বৈদিক কালে সে সে দিন যজ্ঞ হইত, পৌরাণিক কালে দেব-দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছিল।

কিন্তু বিষুব দিনদ্বয় ও অয়নাদি দিনদ্বয় স্থির থাকে না। মাস স্থির ধরিলে এই এই দিন পিছাইয়া আসিতেছে। আমরা বলি ঋতু পিছাইয়া আসিতেছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যে মাসের যে দিন উত্তরায়ণ হইত, এখন তাহা পূর্ববর্তী মাসে হইতেছে। ভারতের পূর্ব-কাল অল্পকাল নয়, দুই তিন সহস্র বৎসরে গণনীয় নয়। তিন চারি পাঁচ ছয় সহস্র বৎসরের স্মৃতি যজ্ঞ ও পূজার দিনে রক্ষিত হইয়াছে। এত দীর্ঘ কালের স্মৃতি আর কোন জাতির নাই। অনেক স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে। অনেক নূতন স্মৃতি আসিয়াছে। কিন্তু নূতন হইলেও পুরাতন।

মহাভারত বনপর্বে (সংস্কৃত মূলে ১২৮ অঃ, কালীসিংহ-কৃত বঙ্গানুবাদে ১২৭ অঃ) কার্ত্তিকের জন্ম-বৃত্তান্তে শ্রীপঞ্চমী নামের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। উপাখ্যান দীর্ঘ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। বর্তমানে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উদ্ধৃত করিতেছি। অসুরেরা দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবতা এক মহাবল দেবসেনাপতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক অমাবস্যার পর দিন অগ্নির পুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় এক শ্বেতপর্বতের শরবনে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি শুক্ল পঞ্চমীতে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মূর্তিমতী শ্রী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি দেবসেনা-পতি বৃত হইলে। "ব্রাহ্মণগণ যাহাঁকে ষষ্ঠী সুখপ্রদা লক্ষ্মী . . বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের (কার্ত্তিকের) মহিষী হইলেন। তিনি পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাহাঁর প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছিল (অসুরগণ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল), এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।"

এইখানে শ্রীপঞ্চমী নামের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি। যে শুক্ল পঞ্চমীর সহিত ষষ্ঠী যুক্ত হয়, তাহার নাম শ্রী-পঞ্চমী, অপর নাম লক্ষ্মী-পঞ্চমী।

কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে এক বিশেষ মাসের শুক্ল পঞ্চমী

শ্রীপঞ্চমী নামে লক্ষিত হইয়াছে। কোন্ মাসের অমাবস্যার পরদিন কুমারের জন্ম হইয়াছিল? বেদে যজ্ঞাগ্নিকে কুমার বলা হইয়াছে। দুই অরণি-যোগে অগ্নি জাত হয়। এই হেতু অগ্নির নাম কুমার। কার্ত্তিকেয় কুমার। তাহাঁর পিতা অগ্নি। অর্থাৎ এক যজ্ঞ দিনে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। ছয় কৃত্তিকা তারা কুমারের ধাত্রী। এই কারণে কুমার ষড়ানন। ধাত্রী ছয় বলিয়া তাহাঁরা ষষ্ঠী, নবজাত শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে (ষেটেরায়) সূতিকা ষষ্ঠী এবং বটবৃক্ষমূলে ষষ্ঠীঠাকুরাণী। এসব কথা মহাভারতে আছে। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের নিকটে চন্দ্রসূর্যের অমাবস্যা হইলে পরদিন যজ্ঞ হইত। সে অমাবস্যা বৈশাখী অমাবস্যা, অন্য মাসের অমাবস্যা হইতে পারে না। সে অমাবস্যায় বাসন্ত বিষুব পড়িত। এই কারণে যজ্ঞ হইত। বৈশাখ অমাবস্যায় বাসন্ত বিষুব হইলে ছয় মাস গতে ষষ্ঠীতিথিতে, সূক্ষ্মগণিতে সাড়ে পাঁচ তিথিতে, শারদ বিষুব হয়। অতএব মহাভারতের শ্রীপঞ্চমী অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পঞ্চমী। আর সে ষষ্ঠী পাঁজিকাতে গুহষষ্ঠী নামে লিখিত আছে। গুহ কার্ত্তিক। অর্থাৎ শরৎকালে কার্ত্তিক অমাবস্যার পরদিন কার্ত্তিকের জন্ম হইয়াছিল। তখন শ্বেত পর্বতের শরবন পুষ্পিত ও শুভ্র হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমীতে তিনি দেব-সেনাপতি হইয়াছিলেন। সেদিন লক্ষ্মীদেবী তাহাঁকে আশ্রয় করিয়া-ছিলেন, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে এক বিশেষ যোগ হইয়াছিল। সে যোগ শারদ বিষুব ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই তথ্য উপলক্ষ্য করিয়া কবি রূপক ও উপরূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্বের ঘটনা। সে কালে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের নিকট বাসন্ত বিষুব হইত। যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৪৫০ অব্দে) এইরূপ হইত। শারদ বিষুব দিন হইতেও সে কাল গণিতে পারা যায়। অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে শারদ বিষুব হইত। সেদিন সৌর অগ্রহায়ণের পাঁচ ছয় দিন হইতে পারে। এখন সৌর আশ্বিনের সাত দিনে শারদ বিষুব হইতেছে। অর্থাৎ শারদ বিষুব দুই মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। গণনার পূর্বে দুই মাসে ৪৩০০ বৎসর গত হইয়াছে।

অবশ্য ঘটনাটি মহাভারতে অনেক কাল পরে লিখিত হইয়াছে। তখন ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি গণ্য হইয়াছে, এবং ছয় সৌর মাসে ছয় তিথি বৃদ্ধি না ধরিয়া সাড়ে পাঁচ তিথি ধরিবার বিধি হইয়াছে।

ইহার হেতু লিখিতেছি। মাহেশ্বর যুগ নামে এক যুগ গণনা প্রচলিত ছিল।* ভারতে যুদ্ধের পর হইতে, খ্রী-পূ ১৪৪০ অব্দ হইতে এই যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পরিমাণ ২৪৭ সায়ন সৌরবর্ষ ও ১ মাস। প্রত্যেক যুগ শুক্ল ষষ্ঠীর অন্ত ও নূতন যুগ শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। যুগটি এখন লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাঁজিতে শুক্ল ষষ্ঠী ও শুক্ল সপ্তমীর নাম লিখিত হইতেছে। এই যুগ হইতে শুক্ল সপ্তমী রবির তিথি হইয়াছে। এই যুগ অনুসারে ছয় সৌর মাসে সাড়ে পাঁচ তিথি আসে।

মহাভারতের উপাখ্যানে পাইয়াছি শুক্ল পঞ্চমীর সহিত ষষ্ঠী যুক্ত হইলে শ্রীপঞ্চমী। এই অর্থে প্রতিমাসেই শ্রীপঞ্চমী হয়। কারণ এক সূর্যোদয়কালে পঞ্চমী আরম্ভ হইয়া পর সূর্যোদয়ে পূর্ণ হয় না। অতি কদাচিৎ পঞ্চমী মাত্র একদিনব্যাপী হয়। ষট্‌পঞ্চমী ব্রতে প্রতি মাসেই লক্ষ্মীপূজা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সে ব্রতের আরম্ভ। ইহারই বা হেতু কি? অর্থাৎ কি কারণে ষষ্ঠী তিথি লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত বেদের কালে যাইতে হইবে। সে কালে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে যজ্ঞ হইত। উভয় দিনের অন্তর ছয় সৌর-মাস। পূর্ব কালে সৌরমাস গণনা ছিল না, চান্দ্রমাস গণনা ছিল।

---

* এই যুগের কি নাম ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। সোম সিদ্ধান্তে আছে, এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ দ্বাপরে (অর্থাৎ ভারত-যুদ্ধ বৎসরে) মহেশ্বর ব্রহ্মা হইয়াছেন। বায়ু পুরাণে (৩২ অঃ) চতুর্মুখ মহেশ্বরের এক মুখে ভীষণ কলি আরম্ভ হইয়াছে। এই দুই বচন মিলাইয়া যুগের নাম মাহেশ্বর মনে হইয়াছে।

খ্রী-পূ ৬৯৯ অব্দে অগ্রহায়ণ শুক্ল সপ্তমীতে এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। সে সপ্তমীর নাম মিত্র-সপ্তমী, পূর্বদিনের নাম গুহষষ্ঠী ছিল। কিন্তু সে বৎসর সে ষষ্ঠীতে শারদ বিষুব হয় নাই, তাহার পূর্বমাসে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে হইয়াছিল। অতএব মহাভারতের উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ নাই। আরও জানিতেছি, সে উপাখ্যান সে যুগের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

এই কারণে মাস বলিলেই চান্দ্রমাস বুঝায়। আর, দেবদেবীর পূজার দিন চান্দ্রমাসে ও চান্দ্রদিনে (তিথিতে) নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক অমাবস্যায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে ষষ্ঠ অমাবস্যা গতে ষষ্ঠ তিথিতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে। তখন বর্ষা আরম্ভ, শস্য বপনের কাল। অন্ন লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আগমনের কাল। এই সম্বন্ধ হেতু বর্ষাঋতুর প্রথম মাসের শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছিল। তদবধি অন্য মাসেরও শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। অন্য দিকে এক অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলে ছয় চান্দ্র মাস গতে ষষ্ঠ তিথিতে উত্তরায়ণাদি হইবে। সেদিন আমরা সরস্বতী পূজা করি। পূর্বে পাইয়াছি, পরে আরও স্পষ্ট হইবে, লক্ষ্মী-সরস্বতী একেরই দুই অংশ। পৃথক্ কল্পনা করিলে দুয়েরই পূজা করা উচিত। অতএব জানিলাম, উত্তরায়ণাদি দিবসে সরস্বতী পূজা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ষষ্ঠীতে না হইয়া পঞ্চমীতে কেন?

এইখানেই প্রশ্নের শেষ হইল না। যদি উত্তরায়ণাদি দিন চাই, শুক্ল প্রতিপদে হইতে পারিত, মাঘ মাস না হইয়া ফাল্গুন মাসে হইতে পারিত। কারণ এককালে ফাল্গুন মাসে উত্তরায়ণাদি হইত। অতএব এক বিশেষ বৎসর লক্ষ্য হইয়া মাঘ শুক্ল পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী হইয়াছে। আমার বোধ হয় এক মাহেশ্বর যুগ এই বিধির আদি। এইরূপ বিধির উদাহরণ আরও আছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। মাঘ শুক্ল সপ্তমী এক বিখ্যাত তিথি। রথসপ্তমী, ভাস্করসপ্তমী প্রভৃতি ইহার নানা নাম আছে। সেদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার অপেক্ষায় মহাভারতে ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন। শকপূর্ব ৩৫ অব্দে (৪৩।৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) এক মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। সে বৎসর মাঘ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

কার্যের কারণ অনুমান সকল স্থলেই দুরূহ। উক্ত অব্দের মাঘ শুক্ল পঞ্চমী কালক্রমে "শ্রীপঞ্চমী" নামে খ্যাত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই। এই অনুমানের পক্ষে দুইটি দুর্বল যুক্তি আছে। (১) মাহেশ্বর যুগানুসারে উক্ত উত্তরায়ণ পঞ্চমী-ষষ্ঠীর প্রায় সন্ধিক্ষণে ঘটিয়াছিল। (২) সে দিন বুধবার। পর দিন গুরুবার ষষ্ঠী। এই

বারে লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত আছে। উক্ত তিথির পূর্বাপর যুগের উত্তরায়ণ তিথি দেখিলে সন্দেহ লঘু হয়। যথা—

খ্রী-পূ	৪৫২ অব্দে উত্তরায়ণ মাঘ শুক্ল	সপ্তমী,	রথসপ্তমী
	২০৫	ষষ্ঠী,	শীতলাষষ্ঠী
খ্রী-পর	৪৪	পঞ্চমী,	শ্রীপঞ্চমী
	২৯১	চতুর্থী,	গণেশচতুর্থী
	৫৩৮	তৃতীয়া,	—

তৃতীয়াতে কোন পূজা নাই। বোধ হয় প্রাচীন পুরাণকার সে যুগ দেখেন নাই। সে যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানিতেছি, ৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে মাঘ শুক্লপঞ্চমী "শ্রীপঞ্চমী" নাম পাইয়াছে। সেদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।

বেদের সরস্বতী

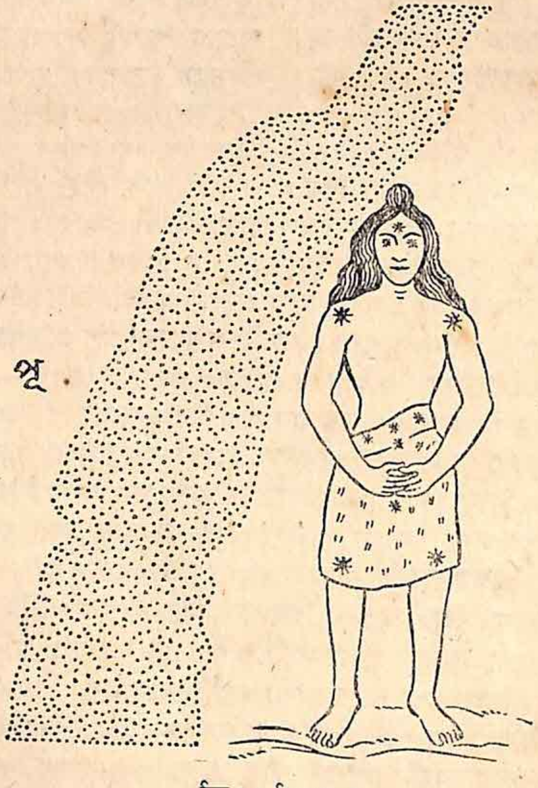
উপরে দেখা গিয়াছে কেহ কেহ লক্ষ্মী ও সরস্বতী অভিন্ন বিবেচনা করিয়াছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গাও বটেন। কালিকাপুরাণ মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছেন। দেবীপুরাণে (৩৭ অঃ) লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গার নাম। দেবীপুরাণ রাজপুতানায় সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত। রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণ হইতে সরস্বতীর প্রণাম-মন্ত্র তুলিয়াছেন, 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ' অর্থাৎ সরস্বতী ও ভদ্রকালী এক। ভদ্রকালী অতসীকুসুম-শ্যামা। দুর্গার এক রূপ। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। কারণ ঋগ্‌বেদে বাগ্‌-দেবী সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী। আমরা দুর্গানামে তাহাঁর পূজা করি। এখানে ইহার ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। এক কথায়, লক্ষ্মী সরস্বতী ও দুর্গা যজ্ঞরূপা। মহাভারতে বনপর্বে সরস্বতী-তার্ক্ষ্য-সংবাদে (মূলে ১৮৬ অঃ, বঙ্গানুবাদে ১৮৫ অঃ) সরস্বতী বলিতেছেন, "আমার দিব্যরূপ দর্শন ও আমাকে যজ্ঞস্বরূপা বোধ করিলে মুক্তি লাভ করিবে।" ইহার পরে মহাভারতে সরস্বতীর বিদ্যরূপ বর্ণিত আছে।

ঋগ্‌বেদে সরস্বতী দুইটি। একটি স্বর্গে, অপরটি মর্ত্যে। মর্ত্যের সরস্বতী এক নদী। স্বর্গের সরস্বতী শুভ্রা জ্যোতির্ময়ী নদী। ইনি

দিব্য সরস্বতী। সরস্বতী নামের ব্যুৎপত্তি, যাহাতে সরস্ জল আছে। আমরা জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞাত পদার্থের নাম করিয়া থাকি। রাত্রে আকাশে তারা-সন্নিবেশ দেখিয়া বলি যেন নৌকা, যেন সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি। কালে 'যেন' শব্দটি লুপ্ত হয়, নক্ষত্রের নাম নৌকা সর্প বৃশ্চিক ইত্যাদি হয়। ভূতলের সরস্বতী নদীর সাদৃশ্যে স্বর্গের সরস্বতীর নাম হইয়াছে। পুরাণে স্বর্গের সরস্বতীর নাম সুরগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। কালিদাসে ছায়াপথ। ছায়া শব্দের অর্থ দীপ্তি। এক দুগ্ধশুভ্রা দীপ্তিমতী নদী নভোমণ্ডলকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়াছে। বলয়টি উত্তর দক্ষিণে না থাকিয়া ব্রাহ্মণের উপবীত স্কন্ধ হইতে যেমন তির্যক্ লম্বিত থাকে, সেইরূপ তির্যক্ আছে। অবশ্য সমগ্র বলয় এক কালে দেখিতে পাওয়া যায় না। তির্যক্ অবস্থান হেতু নভোমণ্ডলের দৈনিক আবর্তনে বিচিত্র দেখায়। সন্ধ্যার পরে দেখা অপেক্ষা উষার পূর্বে দেখা ভাল। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, বায়ু নির্মল, চিত্ত প্রশান্ত থাকে। কার্ত্তিক মাসের রাত্রি চারিটার সময় আকাশ-প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুরগঙ্গার এক অর্ধাংশ প্রায় মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ছয় মাস পরে বৈশাখ মাসে অপর অর্ধাংশ। কার্ত্তিক মাসে দেখি মহাকালের (কালপুরুষের) মাথার উপর দিয়া সুরগঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। মহাকাল গঙ্গাধর হইয়াছেন। এই গঙ্গা শিব-গঙ্গা (চিত্র ৭)। তখন যে গগনপট দেখি তাহার গাম্ভীর্য মহিমা ও শোভায় যাহার চিত্ত চমৎকৃত না হয় তেমন মানুষ নাই। বৈশাখ মাসের সুরগঙ্গা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ইহাতে মাথার উপরে পাঁচটি তারায় কর্ণসদৃশ শ্রবণা নক্ষত্র, দক্ষিণে বৃশ্চিক। বিষ্ণু শ্রবণার অধিপতি। ঋগ্বেদের ঋষিগণ কর্ণ স্থানে শ্যেন পক্ষী দেখিতেন। শ্যেন পক্ষী পুরাণের গরুড়, বিষ্ণুর বাহন। এই গঙ্গা বিষ্ণুগঙ্গা (চিত্র ৮)। ঋগ্বেদের ঋষিগণ দিব্য সরস্বতী দেখিয়া শীত ঋতুর ও বর্ষাঋতুর আগমন নির্ণয় করিতেন। সে কালে পাঁজি ছিল না, নক্ষত্র দেখিয়া ঋতু নির্ণয় করিতে হইত। তাহাঁরা শীতঋতুর আরম্ভে ও বর্ষাঋতুর আরম্ভে যজ্ঞ করিতেন। সে সময়ে দ্যুতিমতী সরস্বতী শিবগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গা নিরীক্ষণ করিতেন। এই হেতু তিনি প্রজ্ঞাসুমতি-দায়িনী

অন্নধনদায়িনী। পুরাণের সরস্বতী ও লক্ষ্মী একেরই দুই ভাগ। সুরগঙ্গা দুয়েরই প্রতিমা।

রামায়ণে ও পুরাণে ভগীরথ স্বর্গ হইতে সুরগঙ্গাকে মর্ত্যে আনিয়াছিলেন। সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তাহাঁর জলে প্লাবিত



চিত্র ৭। শিব-গঙ্গা

হইয়া তারা-রূপে বিদ্যমান আছেন। সুরগঙ্গা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রা। ইহাই ক্ষীরাব্ধি (ক্ষীর—দুগ্ধ, অব্ধি—সাগর)। লক্ষ্মী ক্ষীরাব্ধি-তনয়া। একবার দেবাসুর মিলিত হইয়া দুগ্ধসাগর মন্থন করিয়াছিলেন। তাহার

ফলে শিবগঙ্গায় লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। পুরাণে বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণ ভাগের নাম বৈতরণী। সুরগঙ্গা দক্ষিণে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই না।



চিত্র ৮। বিষ্ণুগঙ্গা। বামে শ্রবণা, দক্ষিণে শ্যেন

অতএব লক্ষ্মী সরস্বতী একই। উভয়েই বেদের দিব্য সরস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাহাঁর কৃপায় ধনসম্পদ্ বিদ্যা-বুদ্ধি মেধাস্মৃতি লাভ

হয়। শীতঋতুর আরম্ভে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অর্চনা বৈদিক কালের স্মৃতি। আর আশ্বিন পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অতি প্রাচীন বৈদিক কালের বর্ষাঋতুর স্মৃতি। সেই দিন চারি দিক্-হস্তী লক্ষ্মীকে স্নান করায়। যখন আশ্বিন মাস বর্ষাঋতুর প্রথম মাস ছিল তখনকার স্মৃতি। তদবধি বর্ষাঋতু ভাদ্র শ্রাবণ আষাঢ়, তিন মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের স্মৃতি।

পুরাণের সরস্বতী-প্রতিমা শুভ্রা। কারণ বৈদিক প্রতিমা দিব্য সরস্বতী শুভ্রা। প্রতিমার সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসনা, পদ্ম জলের চিহ্ন। একই কারণে লক্ষ্মী-প্রতিমাও শ্বেতপদ্মাসনা। উভয়েই যজ্ঞরূপা, যজ্ঞাগ্নিরূপা, শক্তিরূপা। অগ্নি বিশ্বভুবনের শক্তির চিহ্ন। দুয়েরই প্রতিমা দুর্গার ন্যায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা করিলে দোষ হইত না। কিন্তু দিব্য সরস্বতীর বর্ণের অনুরোধে সরস্বতী-প্রতিমা শুভ্রা হইয়াছে। সরস্বতী-প্রতিমার হস্তে সুধাকলস, সুরগঙ্গার বারিপূর্ণ। সে প্রজ্ঞাবারি যে পান করে, সে অমর হয়।*

---

* জিজ্ঞাসু পাঠক সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ৫০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় "বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে সরস্বতী" প্রকরণ পড়িতে পারেন।

৫

বারমাসে তের পার্বণ

পর্ব

যে যেমন মানুষ, সে তেমন আনন্দ চায়। আনন্দ ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না। হিন্দুর জীবনযাত্রা আনন্দময় ছিল। তাহার বার মাসে তের পার্বণ ছিল।

সংস্কৃত পর্বন্ হইতে পার্বণ। পর্বন্ শব্দের মূলার্থ গ্রন্থি, সন্ধি। ইহা হইতে এক অর্থ উৎসব। বারমাসে তের পার্বণ, তের উৎসব। ঠিক তের নয়, অনেক। একখানা পাঁজি দেখিলে নানা দেবদেবীর পূজা ও নানাবিধ ব্রতের দিন পাওয়া যাইবে। পুরাণে এসকলের প্রমাণ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র-কার সেই প্রমাণে এক এক পূজার ও এক এক ব্রতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এসকল ব্যতীত স্মৃতিবহির্ভূত পার্বণ আছে, সেসব আচার। কোন্ জাতির এত পার্বণ আছে? কোন্ জাতি এত উৎসবের আনন্দ ভোগ করে? কোন দুইটি পার্বণ এক প্রকার নয়। এই কারণে পার্বণের আনন্দও এক প্রকার নয়।

পার্বণের তিন উদ্দেশ্য। পুরাণ-ও শাস্ত্র-কার বুঝিয়াছিলেন, মানুষ একই প্রকার নিত্যনিয়মিত কর্ম করিতে পারে না। সে নিত্যনিয়মিত কর্মের বিরাম চায়, কর্মের বৈচিত্র্য চায়। না পাইলে তাহার চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল হয়, তাহার কর্মে শৈথিল্য আসে। দ্বিতীয়তঃ মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাম বিষয়ের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নিরন্তর উপভোগ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। যতই ভোগ করে, তৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যায়। তাহার সন্তোষ নাই। যাহার সন্তোষ নাই, তাহার শান্তিও নাই। লোকে বুঝে না, চিত্তের আশ্রয় চাই। শান্তির উৎস তাহার অন্তরেই আছে। প্রত্যহ না হউক, মাঝে মাঝে এক এক দিন সেই আত্মারামের ধ্যান করিতে পারিলে, দুর্বলের চির-আশ্রয়, চির-শরণের সম্মুখীন হইতে পারিলে অশান্ত চিত্তে শান্তি

আসে। যে সুখের পরিণাম আনন্দ, সে সুখই সুখ। সে সুখ শান্তি-সুখ। অনেক ভুগিয়া অনেক সহিয়া এক বৃদ্ধ বলিতেন, "দাদা, টাকায় সুখ নাই।" শাস্ত্রকার মোহাচ্ছন্ন মনকে বলপূর্বক বিষয় হইতে অন্য-দিকে টানিয়া লইয়া যান। প্রত্যেক পার্বণে, প্রত্যেক উৎসবে ভগবৎচিন্তা আছেই আছে। যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য তেমন ব্যবস্থা আছে। এমনটি আর কোনও জাতির নাই। খ্রীষ্টান রবিবারে নিত্যকর্ম হইতে বিরত হন, সকাল-সন্ধ্যায় গীর্জায় যান, ঈশ্বর-চিন্তা ও আত্মচিন্তা করেন। কিন্তু প্রত্যেক রবিবারে সেই এক বিধি। অধিকারী অনধিকারী সকলের পক্ষেই সেই এক বিধি।

যে সে দিন পার্বণ হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। এই-সকল দিন ইচ্ছামত নির্দিষ্ট হয় নাই। বৎসরের যে যে দিন আমাদের জানিতে হয়, স্মরণ রাখিতে হয়, বাছিয়া বাছিয়া সেসকল দিনের সহিত পূজা ও ব্রতারম্ভ সংযোজিত হইয়াছে। ইহা পার্বণের তৃতীয় উদ্দেশ্য। আমরা সকল দিন-নির্দেশের হেতু বুঝিতে পারি না। সহজে কতক-গুলির পারি, অনুসন্ধান করিলে আরও কতকগুলির পারি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কয়েকটি দিন নির্দেশের হেতু বলা যাইবে।

আচারের দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষলী পার্বণ বা পিঠা পরব। কত কষ্টের, কত যত্নের ধান্য গৃহাগত হইয়াছে। যে ধান্য গৃহস্থকে সপরিবারে জীবিত রাখিবে, সে ধান্য আসিলে তাহার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাঁর পূজা চাই, তাহাঁকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। গৃহিণী ধানের মরাই, গোলা প্রভৃতি খড় দিয়া বাঁধেন, পেঁটরাও বাঁধেন। আর ছেলেরা বলিতে থাকে, "আওনি, বাওনি, চাওনি। তিন দিন পিঠা খাওনি॥" লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন হইয়াছে; তিনি গৃহে চিরদিন থাকুন, এখন এই প্রার্থনা (চাহনি)। যে সে পিঠা নয়, পুলি-পিঠা। যে পিঠার মধ্যে নারিকেলের পুর থাকে সেই পিঠা, পুর-পিঠা বা পুলি-পিঠা। নূতন তণ্ডুল সুস্বাদু, নারিকেল-যোগে আরও সুস্বাদু হয়। কোনো পিঠা শৃঙ্গাটক (পানিফলের মত), কোনো পিঠা স্বস্তিক (চতুর্ভুজ)। সে সময় নূতন আখের গুড়ও দেখা দেয়। তেমন স্বাদু ঝোলা গুড়

(ফাণিত) অন্য সময় পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বাড়িতেই পিঠা। কাহাকেও বলিতে হয় না, এই উৎসব করিতে হইবে। এইরূপ, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে আশ্‌কে (আশুকিয়া) পিঠা, আশুধান্যের পিঠা। পূর্ব-বঙ্গে ইহার নাম চিতই পিঠা (স° চিতি, রাশি, স্তূপ)। ইহার পাক-প্রণালী ভিন্ন, আস্বাদও ভিন্ন। স্মৃতিতে ব্যবস্থা আছে, দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাইতে হইবে। বৈদিককালের পুরোডাশ এইরূপ ছিল, কিন্তু প্রায়ই যবচূর্ণের হইত। আশুধান্য আশ্বিন মাসে পাকে। আশ্বিন মাসে আশ্‌কে পরব না হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে কেন? কথাটা চিন্তনীয়। কোন অতীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে আশু ধান্য ফলিত কি? আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতু আরম্ভ হয়। যে কালে অগ্রহায়ণ মাসে শরৎ প্রবেশ করিত, আশ্‌কে পরব কি সেই অতীত কালের স্মৃতি? গ্রাম-বাসীর পক্ষে পিঠা-পরব সামান্য ব্যাপার নয়। নগরবাসী পিঠা-পরবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

রন্ধনীরও কর্মের বিরাম চাই। মাঝে মাঝে অরন্ধন ও ভোজ্যান্তর আছে। দশহরার দিন ভোজ্যান্তর। সেদিন দধি, দুগ্ধ, মুড়ি, মুড়কি ও আম-কাঁঠাল যোগে 'ফলার'। বোধ হয় পূর্বে খই, দই ও ফল ভক্ষণ নিয়ম ছিল। এই হেতু রাঢ়ে নাম খই-ঢেরা, শুদ্ধ নাম খই-ধারা। তার পর কোথাও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে, কোথাও ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন। সেদিন মনসা পূজা। কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে উনান জ্বালা হয় না। পূর্ব রাত্রে অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া রাখা হয়। পরদিন তাহাই ভোজ্য। উনানে মনসার ডাল রাখিয়া দুগ্ধে স্নান করাইয়া মনসাপূজা হয়। কোথাও কোথাও মনসার প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। পূর্ববঙ্গে শ্রাবণ মাসের ৫ই হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত সর্পালঙ্কৃত অপক্ক ঘটে এবং শেষদিন প্রতিমায় পূজা হয়। মনসাদেবী বৃক্ষ-বিশেষে থাকেন। এই হেতু পশ্চিমবঙ্গে সে বৃক্ষের নাম মনসা হইয়া গিয়াছে। সে বৃক্ষের সংস্কৃত নাম স্নুহী, বাংলায় পাতাসিজ, পূর্ববঙ্গেও সিজ। কিন্তু সেখানে অরন্ধন নাই। দশহরাতেও অরন্ধন নাই। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন দিবাভাগে উপবাস, রাত্রে চিপিটক ও নারিকেল ভক্ষণ বিহিত। কিন্তু সে বিধি নামমাত্র পালিত হইতেছে।

অম্বুবাচী এক বিশেষ দিন। সেদিন বর্ষা-আরম্ভ। পৃথিবী রসসিক্তা হয়, রজঃস্বলা হয়, অশুচি হয়। তিনদিন অশৌচের পর বীজ বপন এবং যথাকালে বীজ হইতে ফলোৎপাদন হয়। এই তিনদিন কৃষক হলকর্ষণ করে না, ভূমিখননও করে না। বিধবা ও অনেক ব্রাহ্মণ অশুচি পৃথিবীর স্পর্শে অন্নপাক করেন না, ফলমূল খাইয়া থাকেন। বর্ষাহেতু বিল হইতে বিষধর সর্প বহির্গত হইয়া গৃহে, বিশেষতঃ নির্জন নিম্ন-ভূমি পাকশালার উনানে আশ্রয় লয়। সর্পের পানের নিমিত্ত দুগ্ধ রাখা হইত, সর্প কাহাকেও দংশন করিত না। বিধি আছে, সর্পভয়-নিবারণের জন্য দুগ্ধপান কর্তব্য। মানুষে পান করিলে সর্পভয়-নিবারণ হইতে পারে না। পরে দেখা যাইবে, আমরা যেদিন অরন্ধন করি, সেদিন অম্বুবাচী হইত।

সরস্বতী পূজার পরদিন ষষ্ঠীতে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বদিনের রাঁধা অন্নব্যঞ্জন খাইবার আচার আছে। আর পুত্রবতী নারী বাটনা-বাটা শিলে পিঠালীর জলে ষাইট নরমূর্তি লিখিয়া হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত করেন; ব্রাহ্মণ তাহাকে শীতলা ষষ্ঠী নামে পূজা করেন। পূর্ববঙ্গে এই আচার নাই। আমার বোধ হয়, এই দুই আচারই ভুলক্রমে চলিতেছে। এই ষষ্ঠীর নাম শীতলা ষষ্ঠী। ইহার অর্থ শীতল ভোজ্য গ্রহণের ষষ্ঠী না হইয়া শীতঋতু-আরম্ভের ষষ্ঠী হইতে পারে। বস্তুতঃ শীতের দিনে পর্যুষিত অন্নব্যঞ্জন রুচিকর হইতে পারে না। স্কন্দ কার্ত্তিকেয়, তাহাঁর ছয় মাতা। তাহাঁরাই ষষ্ঠী, ষষ্টি নয়। কিন্তু স্কন্দষষ্ঠী আর একদিন, এই দিন নয়। পূর্ববঙ্গে এই অরন্ধনও নাই। সেখানে সরস্বতীপূজার দিন এক জোড়া ইলিশমাছের ঝোল খাইতেই হয়। বিজয়া দশমীর দিন হইতে ইলিশ-ভক্ষণ বন্ধ ছিল। ইলিশমাছের ডিম হয়, এই কারণে এই কয়মাস ইলিশমাছ মারা হয় না। প্রয়োজনবশে আচারের উৎপত্তি হয়।

স্থানে স্থানে নানা প্রকার উৎসব আছে। সেসকল উৎসবে বহু লোক একত্র হয়। মনে পড়িতেছে, বাল্যকালে আরামবাগের অন্তঃপাতী বালি গ্রামে রাসোৎসব দেখিতে যাইতাম। এক জমিদার রাসোৎসব করিতেন। একটা পুরাতন তেলানিয়া পুকুরের সম্মুখের তিন পাড়ে

সোলার কদমগাছ, আরও কত কি গাছ রোপিত হইত। সে-ই বৃন্দাবন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় বৃন্দাবনের অপূর্ব শোভা হইত। আর অপরাহ্ণে পুকুরের মাঝখানে একটা মঞ্চের উপরে পুতুলনাচ হইত। দূরে পুকুরের আড়ায় বসিয়া কারিকর দোড়ি টানিত। আর নারীমূর্তি নানাভঙ্গিতে নাচিত। চারি পাড়ের অগণ্য দর্শক হাঁ করিয়া দেখিত। রাত্রিতে যাত্রা হইত। কতদূর হইতে সহস্র সহস্র দর্শক ও শ্রোতা সে রাসোৎসব দেখিতে যাইত! একদিন নয়, তিনদিন। এইরূপে দেশের লক্ষ্মীমন্তেরা আনন্দদান করিতেন।

চৈত্র মাসে বারুণী। আরামবাগের এক ক্রোশ দক্ষিণে রাজা রণজিৎ রায়ের বিস্তীর্ণ দীঘি আছে। তাহার জলে সহস্র সহস্র নরনারী বারুণী স্নান করিত। সে বিস্তীর্ণ দীঘির চারিদিকের নির্মল জল ঘোলা হইয়া উঠিত। উচু পাড়ে অগণ্য দোকান বসিত। বাঁশের চারি খুঁটি, উপরে চাদর। নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইত। গ্রামের কুলনারী হাটে যান না, নিজে দেখিয়া কোন কিছু কিনিতে পান না। এই বারুণীর দিন পাড়ের দোকানে দোকানে দেখিয়া বেড়াইতেন; নিজের ইচ্ছামত দেখিয়া বাছিয়া জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইতেন। কোথাও বটতলার বহির দোকান। ক্রেতার ভিড় হইয়াছে, একটু পড়িয়া দেখিতেছে। রামায়ণ, শতস্কন্ধ-রাবণবধ, দাশুরায়ের পাঁচালি, রুক্মিণী-হরণ, শিশুবোধক, অল্পদামের আরও অনেক প্রকার বই বিক্রয় হইত। কোথাও লোহার কড়া-বেড়ী-খন্তী, কোথাও তালা-চাবি-ছুরী-ছুঁচ, কোথাও মনিহারী দোকানে আশী-চিরণী-কাঁকই-ঘুনসী, কোথাও ছেলেদের খেলনা ও পুতুল, তাল-পাখা তালপাতার বোনা ও বাঁশের চাঁচের পাখা ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সেখানে কিনিতে পাওয়া যাইত। তখনও বিলাতী জিনিস আসে নাই, সব দেশী। কেবল ছেলেদের জামার ছিট ও ঘড়ঘড়ি খেলনার টিন বিলাতী। স্থানে স্থানে ময়রা ভিয়ান করিত। পুরী-কচুরী নয়, ঘর হইতে মিঠাই ও নারিকেল সন্দেশ আনিত, আর সেখানে তেলে ভাজা গুড়ে ঝিলাপী করিত। এই ঝিলাপী যে কি সুস্বাদু হইত, এখন তাহা স্বপ্নেরও অতীত। তেল খাঁটি সরিষার নয়, তিলই বেশী থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঝিলাপী খাইতে ভাল-

বসিতেন। নিশ্চয় তিনি এই ঝিলাপী খুঁজিতেন। ইহাই তাহাঁর দেশের ঝিলাপী, বাল্যকালের ঝিলাপী। কত বর্ষীয়সী নাতির জন্য দুই-এক পয়সার ঝিলাপী কিনিয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। নাতি ছোট, ঘরে আছে, আসিতে পারে নাই। কেহ নাতির জন্য খেলনা লইয়া যাইতেন। এইরূপ, যাহার যেরূপ সাধ, সে বারুণীর জাতে মিটাইয়া আসিত। দীঘির মাহাত্ম্যও কম নয়। নিকটে দ্বারকেশ্বর নদী। নদীতে স্নান নয়, সেই দীঘিতে স্নান। এক গ্রাম্য কবি দীঘির মাহাত্ম্যবর্ণনার এক গাথা রচনা করিয়াছিলেন।

আষাঢ় মাসে নিকটবর্তী সালেপুর গ্রামে রথ। লোকারণ্য হইত। রথ বড়। যে সে গ্রামে রথ থাকে না। নানা দোকান পাট বসিত। ছেলেদের পুতুল প্রচুর বিক্রয় হইত। পোড়া মাটির রং-মাখান পুতুল, শিমুল কাঠের কুঁচবর্ণ লাটিম ও ছেলেদের সেই বর্ণের চুষিকাঠি বিক্রয় হইত। ময়রা চিনির রথ বিক্রয় করিত। কড়া পাকের চিনি ছাঁচে ঢালিয়া রথ করিত; খাইতে অতিশয় মিষ্ট। তেলে ভাজা গুড়ো ঝিলাপীও প্রচুর বিক্রয় হইত। তৎকালে পয়সার দাম বেশী ছিল। রথ দেখিতে দুই আনা পয়সা কম হইত না।

গ্রামে আরও উৎসব আছে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। সকল শিবের হয় না। গ্রাম-ষোলআনার শিবের হয়। সকল গ্রামে এই শিব নাই, গাজনও হয় না। লোকে মানসিক করে, কয়েকদিনের নিমিত্ত শিবের সন্ন্যাসী হয়। শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ঢাক বাজিতে থাকে; প্রখর গ্রীষ্মে কড়াং কড়াং শব্দ করে। পাঁচ-সাত দিন ধরিয়া গ্রামে সাড়া পড়িয়া যায়। কোথাও কোথাও অপরাহ্নে চড়ক হয়। পাশের দশ-পনর খানা গ্রামের লোক গাজন ও চড়ক দেখিতে আসে। শিবের গাজনের অনুকরণে কোথাও কোথাও ধর্মের গাজন হয়। শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু "গাজন" শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।

যে কালের কথা লিখিতেছি, এখন আর সে কাল নাই। এখনও লোকে বারুণীর দিন দীঘিতে প্রাতঃস্নান করে, সালেপুরের রথযাত্রায়

লোকের ভিড় হয়, কিন্তু সে প্রাণ আর নাই। সে পুরাতন রাসোৎসব অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কমলা চঞ্চলা, একগৃহে চিরদিন থাকেন না। এখনও গাজন হয়। সন্ন্যাসী সূতার উত্তরীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া হাতে বেত্র লইয়া 'গাজন তোলেন'। ঢাকী তাহার ছোট ঢাক ছিটের কাপড় দিয়া মুড়িয়া বকের পালকের হস্তিশুণ্ডাকার গজকা আঁটিয়া বাজায়। সবই হয়, হয়ও না। লোকের সে উৎসাহ নাই, আনন্দ-উপভোগের ক্ষমতা নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের যাবতীয় উৎসবের উদ্‌যোক্তা ছিলেন। তাহাঁরাই গ্রামবাসীকে নানা প্রকারে আনন্দদান করিতেন। গ্রামবাসী তাহাদিগকে আপনজন মনে করিত। অল্পে অল্পে সে শ্রেণী অদৃশ্য হইতেছে। যাহাঁরা অর্থোপার্জন করিয়া ধনবান হইতেছেন, তাঁহাদের সে কৌলিক ধারা নাই, দেবদেবীর পূজায় শ্রদ্ধা নাই। তাহাঁরা রামায়ণ ও ভাগবতপাঠ করান না; বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা করান না। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থই জানেন না। এখন নগরবাসী পতাকা লইয়া পথে পথে ভ্রমণ করেন এবং মনে করেন, উৎসব হইতেছে। আর, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার সমাপ্তি হইতেছে। তাহাঁরা জানেন না, উৎসব মাত্রেরই তিনটি অংগ আছে। প্রথমে দেবার্চনা, তারপর কর্মের অনুষ্ঠান, অবশেষে ভুরিভোজন।

কত দেবদেবীর পূজা হইত, এখনও হইতেছে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী-পূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি হইতেছে। কিন্তু সে সে পূজায় ক্রমশঃ তামসিক ভাব আসিতেছে। শিল্পী প্রতিমা নির্মাণে ধ্যানের প্রয়োজন বুঝিতে পারেন না। ধ্যানে দুর্গাপ্রতিমা তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা। কিন্তু কলিকাতায় চম্পকবর্ণা দেখিয়াছি। নগরে কালীপ্রতিমার জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। দেখিলে মনে হয় যেন একটা কৃত্রিম জিহ্বা মুখে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জিহ্বা লক্‌লক্‌ করিতে পারে না। কালীপ্রতিমা-নির্মাণ অতিশয় কঠিন, যে সে শিল্পীর কর্ম নয়। সেকালে পাঠশালার পড়ুয়ারা মাসে মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে তালপাতার তাড়ী, বই ও দোয়াত-কলমে সরস্বতী পূজা করিত। এখন নগরে নগরে বৎসরে মাত্র একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরস্বতী প্রতিমার পূজা করে। তাহাঁর হাতে পুস্তক, মস্যাধার ও লেখনী থাকে না, থাকে বীণা! ছাত্রেরা

বিদ্যালয়ে গন্ধর্ব বিদ্যা শিখিতে যায় না। অনেক কাল পূর্বে এক বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত সরস্বতীর চিত্র দেখিয়াছিলাম। দীনা, শীর্ণা, কোটরনয়না, অবসন্নদেহা এক তরুণী বীণা বাজাইতেছেন। মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া পড়িয়া তাহাঁর এই দশা হইয়াছে। সরস্বতী নিজে বিদ্যাভ্যাস করেন না, তপঃ-ক্লেশ করেন না। প্রসন্না হইলে তিনি বিদ্যাদান করেন। অবনতি একদিকে নয়, নানাদিকে ঘটিয়াছে।

এখনও গ্রামবাসী সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এখনও শিল্পজীবী যন্ত্র রাখিয়া বিশ্বকর্মা পূজা করে, পোতবাহী নৌকায় গঙ্গাপূজা করে, গৃহস্থ গো-পার্বণ করে, ধানের রাশিতে লক্ষ্মী-পূজা করে, কোথাও কোথাও প্রতি বৃহস্পতিবারে ঘটে পূজা করে। কিন্তু এই সহজ ভাব আর বেশীদিন নয়।

এখন বালিকারা ইতুপূজা ও পুণ্যপুকুর ব্রত করে না। পূর্ববঙ্গে মাঘমণ্ডল ব্রতের "আম-কাঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম ম করে", সেই সুমধুর গীত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। নারী ষট্‌পঞ্চমীব্রত, কঠিন সাবিত্রীব্রত ও অনন্ত চতুর্দশীব্রত ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন আর কাহাকেও কঠিন চাতুর্মাস্যব্রত করিতে দেখি না। কদাচিৎ কেহ বর্ষা-কালে গুড় ও অন্য প্রিয় খাদ্য বর্জন করেন। কিন্তু অনেক পুরুষও বৎসরে ছয়দিন উপবাস করেন।

"শোয়া ওঠা পাশমোড়া।
তার অর্ধেক ভীমে ছোঁড়া॥
ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট॥"

অর্থাৎ, চাতুর্মাস্যের শয়ন একাদশী, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থান একাদশী, ভৈমী একাদশী, শিবরাত্রি ও দুর্গাষ্টমী, এই ছয়দিন উপবাস করিবে। সকল ব্রতেই দেহের কষ্ট আছে। মুসলমান রমজান মাসে রোজা রাখেন; দিবাভাগে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। রমজান বৎসরের সকল ঋতুতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। প্রখর গ্রীষ্মকালেও

আসে। তথাপি মুসলমান রোজা পালন করিয়া আসিতেছেন। নবরাত্র-ব্রতে (দুর্গাপূজার নয়দিন) নক্তভোজন বিহিত ছিল; কিন্তু মাত্র নয় দিন।

পূজা মাত্রই ব্রত, ব্রত মাত্রেই সংকল্প প্রধান। ব্রতধারণ দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা হয়, চিত্তের সংযম অভ্যাস হয়, ইষ্টের প্রতি একাগ্র ভক্তি এবং সমুদয় নরনারীর প্রতি উদার ভাব জাগ্রত হয়।

পর্বের দিন

আমাদের পাঁজিতে যেসকল ব্রত ও পূজার দিন লিখিত হইতেছে, সেসকল দিন যদৃচ্ছাক্রমে স্থির হয় নাই। জ্যোতিষিক যোগ, বিশেষতঃ স্মরণীয় যোগ ঘটিলে সেদিন কোন ব্রত ব্যবস্থিত হইয়াছে। ব্রত মাত্রেই দেবার্চনা আছে, দেবার্চনা মাত্রই ব্রত।

'শারদোৎসবে' দেখিয়াছি, নবরাত্র ব্রতই দুর্গাপূজা। ব্রত-অন্তে নূতন শরৎবর্ষ আরম্ভ হয়। সেদিন বিজয়া দশমী। সেই প্রবন্ধে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা এবং ভীষ্মাষ্টমীর হেতু পাইয়াছি। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রার উৎপত্তিও উল্লেখ করিয়াছি।

আমাদের যাবতীয় ধর্মকৃত্য চান্দ্রমাস, তিথি ও নক্ষত্র ধরিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (পরিশিষ্ট পশ্য)। দুই পাঁচটা সৌরমাস সংক্রান্তি ধরিয়া হইয়াছে। সেসব আচার। মাস বলিলেই চান্দ্রমাস বুঝাইত। আমরা বঙ্গদেশে সৌরমাস ও সৌরমাসের দিন গণিয়া থাকি। কিন্তু ভারতের প্রায় তিন ভাগে চান্দ্রমাস ও তিথি গণনা প্রচলিত আছে। মাসে ৩০ তিথি। ১২ মাসে ৩৬০ তিথি। কিন্তু আরও ১১।১২ দিন না গেলে বৎসর পূর্ণ হয় না। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক মাস। এই মাসের প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুক্লপক্ষ। এই কারণে এই মাস পূর্ণিমান্ত। উত্তর ভারতে সম্বৎ-গণনায় পূর্ণিমান্ত মাস চলিয়াছে। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, অমান্ত মাস। এই মাসের প্রথমে শুক্ল, পরে কৃষ্ণ পক্ষ। ভগবদ্‌গীতায় এই মাস ধরা হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে এই মাস গণি, শকাব্দগণনায় অমান্ত মাস ধরিতে হয়। পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত, এই দ্বিবিধ মাস-

গণনাতেই শুক্লপক্ষের মাস-নাম একই। কৃষ্ণপক্ষের মাস-নামে এক মাসের প্রভেদ হয়। যেমন, শ্রাবণ শুক্লাষ্টমী, উভয় পদ্ধতিতেই মাস-নাম শ্রাবণ (চিত্র ২২ পশ্য)। কিন্তু কৃষ্ণাষ্টমী, অমান্ত গণনায় শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী এবং পূর্ণিমান্ত গণনায় ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী। অবশ্য শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী যে দিন, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীও সেই দিন। কেবল মাস-নামে এক মাসের প্রভেদ। অতএব কৃষ্ণপক্ষের তিথির উল্লেখ করিতে হইলে মাস পূর্ণিমান্ত কি অমান্ত, তাহা বলিতে হইবে।

নক্ষত্রের নামে মাসের নাম হইয়াছে। অনুমান হয়, খ্রী-পূ ৩০০০ হইতে খ্রী-পূ ৩২৫০ অব্দের কালে চন্দ্রপথের ২৮টি নক্ষত্র চিহ্নিত হইয়াছিল। তখন নক্ষত্র শব্দে তারাময় আকৃতি বুঝিতে হইত। যেমন, অশ্লেষা বলিলে পঞ্চ-তারক শব-পুচ্ছ আকৃতি বুঝিতে হইত; মঘা বলিলে পঞ্চ-তারক হলাকৃতি বুঝাইত (চিত্র ১ পশ্য)। প্রত্যেক নক্ষত্রের যে তারাটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, সে তারাই সে নক্ষত্রের তারা। যেমন, শকটাকার রোহিণীর উজ্জ্বল আ-লোহিত তারাটি রোহিণী তারা (চিত্র ৫ পশ্য)। হলাকৃতি মঘার উজ্জ্বল নক্ষত্রটি মঘা তারা। এইসকল নক্ষত্র সমান সমান দূরে অবস্থিত নয়। খ্রী-পূ ১৮৫০ অব্দে রবিপথ ২৭ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র এবং যে তারাময় আকৃতি যে ভাগের মধ্যে বা নিকটে ছিল, সে নক্ষত্রের নামে সে ভাগের নাম হইয়াছিল। তৎকালে কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ইত্যাদি ২৭ নক্ষত্র-ভাগ কল্পিত হইয়াছে (চিত্র ২২ পশ্য)। অদ্যাপি আমরা সেই ভাগ ধরিয়া পাঁজি গণিতেছি। সে সময়ে চৈত্রাদি মাস-নামও রচিত হইয়াছিল। যে মাসে চিত্রা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয় সে মাসের নাম চৈত্র। এইরূপে অন্যান্য মাস-নামও হইয়াছে। এসকল চান্দ্রমাস। কতকাল পরে চান্দ্রমাসের নাম দ্বারা সৌরমাসের নামও হইয়াছে, তাহা অজ্ঞাত। এখানে আমাদের সৌরমাসের উল্লেখের প্রয়োজন হইবে না। মাস বলিলেই চান্দ্রমাস বুঝিতে হইবে।

বৎসরে চারিটি দিন স্মরণীয় (চিত্র ২১ পশ্য)। দুই অয়নাদি-(অয়নের আরম্ভ) দিন এবং দুই বিষুব-দিন। যেদিন সূর্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন করেন, সেদিন উত্তরায়ণাদি। যেমন, ২২ ডিসেম্বর। সেদিন

রাত্রি পরম দীর্ঘ, দিবা পরম হ্রস্ব। যেদিন সূর্য উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করেন, সেদিন দক্ষিণায়নাদি। যেমন ২১ জুন। সেদিন দিবা পরম দীর্ঘ, রাত্রি পরম হ্রস্ব। সেদিনই অম্বুবাচী, বর্ষা আরম্ভ ধরা হয়। পৃথ্বী জলসিক্তা হয়, এই হেতু নাম অম্বুবাচী। আর দুইদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। সে দুইদিন বিষুব-দিন। বসন্তকালে যে বিষুব হয়, তাহা মহাবিষুব। যেমন ২১ মার্চ। শরৎকালে যে বিষুব হয়, তাহা জলবিষুব। যেমন ২২ সেপ্টেম্বর।

অয়নাদি পশ্চাদ্‌গামী হইতেছে। প্রায় সহস্র বৎসরে এক নক্ষত্র-ভাগ পিছাইতেছে। নক্ষত্র যেখানে, সেখানেই আছে। সুতরাং মাস যেখানে, সেখানেই আছে। কিন্তু অয়নাদি এবং সেহেতু ঋতু পিছাইতেছে। কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে। রবিপথ দুই অয়নাদি ও দুই বিষুব স্থান দ্বারা চারিপাদে বিভক্ত হইয়াছে। এক এক পাদ অতিক্রম করিতে রবির তিন সৌরমাস লাগে। কিন্তু চন্দ্রের তিন মাসের দুই তিন তিথি অধিক লাগে। স্থূল গণনায় তিন মাস ধরা যাইতে পারে।

যে বৎসর পুষ্যা নক্ষত্র-ভাগের আদিতে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, সে বৎসরই শকমুখ (৭৮ খ্রী)। ২৪১ শক=৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণায়নস্থান এক নক্ষত্র পাদ পিছাইয়া আসিয়া পুনর্বসুর তৃতীয় পাদে হইয়াছিল। সে বৎসরই গুপ্তাব্দ-মুখ। মহাবিষুব হইতে দক্ষিণায়নাদি ৯০°=৬৮° নক্ষত্র। কাজেই অশ্বিনীভাগের আদিতে মহাবিষুব হইত। তদবধি আমরা অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র গণিতেছি। সে সময়ের পাঁজিই বর্তমানে চলিতেছে। বর্তমানে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ; ১৬৩০ বৎসর অতীত হইয়াছে।

২৪১ শকে=৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রপূর্ণিমায় মহাবিষুব-দিন হইয়াছিল। মনে করি, সে সময় সৌরমাস-গণনা প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে তখনকার ঋতুবিভাগ সৌরমাসে এইরূপ ছিল—

চৈত্র-বৈশাখ	. .	বসন্ত
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	. .	গ্রীষ্ম
শ্রাবণ-ভাদ্র	. .	বর্ষা

আশ্বিন-কার্ত্তিক	. .	শরৎ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	. .	হেমন্ত
মাঘ-ফাল্গুন	. .	শিশির

অর্থাৎ, চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাবিষুব, আষাঢ় সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়নাদি, আশ্বিন-সংক্রান্তিতে জল-বিষুব এবং পৌষ-সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণাদি। এই গণনা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে, যদিও বিষুবাদি ২৩ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে পাইতেছি, এই এই সংক্রান্তিতে আমাদের যে-সকল কৃত্য আছে, সেসকল ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছিল কিনা সন্দেহ। শিবের গাজন হইলে মাস ও তিথি ধরিয়া হইত, অরন্ধন ও পিঠা-পরবও মাস ও তিথি ধরিয়া হইত।

কয়েক বৎসর হইতে পূর্ববঙ্গে ও কলিকাতার কেহ কেহ পয়লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব করিতেছে। তাহারা ভুলিয়াছে, বিজয়াদশমীই আমাদের নববর্ষারম্ভ। বৎসরে দুইটা নববর্ষোৎসব হইতে পারে না। পয়লা বৈশাখ বণিকেরা নূতন খাতা করে। তাহারা ক্রেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ধার আদায় করে। ইহার সহিত সমাজের কোন সম্পর্ক নাই। নববর্ষ প্রবেশের নববস্ত্রপরিধানাদি একটা লক্ষণও নাই।

৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমার দিন মহাবিষুব হইয়াছিল। অতএব স্থূল গণনায় ইহার তিন মাস পরে আষাঢ়-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়নাদি, আশ্বিন-পূর্ণিমায় জল-বিষুব এবং পৌষ-পূর্ণিমায় উত্তরায়ণাদি হইত।

এই সময়ের কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, খ্রী-পূ ১৮৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত। তখনকার ছয় ঋতু এইরূপ ছিল—

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	. .	বসন্ত
আষাঢ়-শ্রাবণ	. .	গ্রীষ্ম
ভাদ্র-আশ্বিন	. .	বর্ষা
কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ	. .	শরৎ
পৌষ-মাঘ	. .	হেমন্ত
ফাল্গুন-চৈত্র	. .	শিশির

বৈশাখী পূর্ণিমার তিন মাস পরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়নাদি, ইহার তিনমাস পরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় জলবিষুব, ইহার তিন মাস পরে মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণাদি হইত। এই চারি পূর্ণিমাই প্রসিদ্ধ। বৈশাখী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা স্নান-দানাদির শুভ দিন।

শ্রীকৃষ্ণের রাস, দোল ও ঝুলন যাত্রা

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সেদিন সূর্যরূপ কৃষ্ণ বিশাখা অর্থাৎ রাধানক্ষত্রে থাকেন। ইনি ব্রজের কৃষ্ণ। শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন অর্থাৎ দোলন। এইরূপ মাঘী পূর্ণিমায় সূর্যের উত্তরায়ণ। সেদিন কৃষ্ণের দোলযাত্রা হইবার কথা। কিন্তু কি কারণে কে জানে, প্রাচীন ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের দোল হইতেছে। কোন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের এই তিন যাত্রার উল্লেখ নাই। রঘুনন্দনও (ষোড়শ শতাব্দ) ধরেন নাই। কিন্তু বৃহদ্ধর্মপুরাণ নামক উপপুরাণে পুষ্পপরাগ নিক্ষেপ দ্বারা দোলযাত্রা বর্ণিত আছে। বিষ্ণু-ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের রাস বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহার অনুকরণে লোকে রাসোৎসব করিত না। কৃষ্ণের রাস ও দোলোৎসব বোধ হয় তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। পূর্ববঙ্গের ভবানন্দের হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের দোলের উল্লেখ আছে। সে বই তিনশত বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। ঝুলনযাত্রা আরও আধুনিক। শ্রাবণী পূর্ণিমায় অম্বুবাচী, ঘোর দুর্যোগ। সেদিন ঝুলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু বিষ্ণুর দোলন অবশ্য হইত।

জন্মাষ্টমী

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে গণিয়া গেলে শ্রাবণী পূর্ণিমায় নয়মাস পূর্ণ হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় আরও আটদিন পরে অমান্ত শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। সেদিন অম্বুবাচী ও কৃষ্ণের জন্মতিথি। সেদিনের তিথি শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, নক্ষত্র রোহিণী। পরিশিষ্টে প্রদত্ত গণিত সূত্র হইতে পাইতেছি, সেদিন রবি মঘানক্ষত্রে

ছিলেন। অর্থাৎ মঘানক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। অতএব ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী কল্পিত হইয়াছিল। সেই সময়ের মধ্যে রাস ও ঝুলনও হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠাদি চারি পূর্ণিমা

যজুর্বেদের কালেও (খ্রী-পূ ২৫০০) বৈশাখী পূর্ণিমায় মহা-বিষুব হইয়াছিল। অতএব তৎকালেও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বসন্ত বলিতে পারা যায়। ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দে, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় বসন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আষাঢ়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; অনেক পরের কালে জ্যৈষ্ঠের উল্লেখ আছে। খ্রী-পূ ৩২৫০ অব্দে ধ্রুব, সূর্য ও রোহিণী-তারা একসূত্রে আসিলে মহাবিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইয়াছিল। এই হেতু এই পূর্ণিমার নাম জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। যদি চন্দ্রের নিকট বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে পূর্ণিমা মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। এককালে বৃহস্পতি-বর্ষ নামে এক বর্ষ গণিত হইত; কোথাও কোথাও এখনও হয়। বোধ হয় এই সময় হইতে সে বর্ষ গণনার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তিনমাস পরে ভাদ্র-পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন, তাহার তিনমাস পরে অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমায় জলবিষুব ও তাহার তিনমাস পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ঋতু ক্রমে ক্রমে পিছাইয়া পিছাইয়া যজুর্বেদের কালে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। এই সময়ে মাস-নাম দ্বারা ঋতু-বিভাগ ছিল না। থাকিলে ঋতু-বিভাগ খ্রী-পূ ১৮৫০ অব্দের মত হইত।

জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা, ভাদ্র-পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা ও ফাল্গুন-পূর্ণিমা, চারি পূর্ণিমাই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। সে সে দিন স্নানদানাদি বিহিত। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। এইদিন কেন স্নানযাত্রা, তাহার কারণ থাকিতে পারে (পরে পশ্য)। ভাদ্র-পূর্ণিমা ও পরবর্তীকালের শ্রাবণ-পূর্ণিমার স্থানে ভাদ্র-ও শ্রাবণ-সংক্রান্তি ধরিয়া স্থান-বিশেষে অরন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সে দিন অম্বুবাচী। ঘোর বর্ষা।

দশহরা

জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা অপেক্ষা জ্যৈষ্ঠ-শুক্লদশমী প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই-দিন দশহরা। রঘুনন্দন প্রমাণ তুলিয়াছেন, এইদিন এক সম্বৎসরের মুখ। আমরা সে বৎসর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বুঝিতেছি, ইহার পূর্বদিন মহাবিষুব হইত। নচেৎ সেদিন নববর্ষমুখ হইত না। যে বৎসর অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমায় জলবিষুব হইত, সেই বৎসর জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-নবমীতে মহাবিষুবসংক্রান্তি অবশ্য ঘটিত। কারণ, দুই বিষুব পরস্পর বিপরীত দিকে; ছয়মাসে প্রায় ছয় তিথির অন্তর পড়ে। গণিত দ্বারা জানিতেছি, খৃী-পূ ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠ-শুক্লনবমী কিম্বা দশমীতে মহাবিষুব হইয়াছিল। বর্ষে বর্ষে এই যোগ হইতেছে, কিন্তু বর্ষে বর্ষে মহাবিষুব হয় না, সেই একবারমাত্র হইয়াছিল। এই কারণে তাহার পরদিন দশমী এক বিশেষ পুণ্যদিন। সেদিন গঙ্গাস্নান করিবে এবং মাতৃস্বরূপা গঙ্গার নিকট কৃত দশবিধ পাপখ্যাপন করিবে। লোকে এই বিধির গুরুত্ব বুঝে না। মনে করে, গঙ্গাকে পাপ অর্পণ করিয়া সে শুদ্ধ হয়। কিন্তু এত সহজে পাপমুক্ত হইতে পারা যায় না। মনুতে বচন আছে, 'খ্যাপনেনানুতাপেন ইতি' (১১।২২৮), অর্থাৎ পাপকৃৎ নিজের পাপ খ্যাপন (কথন, জ্ঞাপন), পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন দ্বারা এবং আপৎকালে দান দ্বারাও নিষ্কৃতি লাভ করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিজকৃত পাপ মনে মনেও স্বীকার করিতে পারে, তাহার অনুতাপ জন্মে এবং সে আর সে পাপ প্রায় করিতে পারে না। পাপ বিদিত কিম্বা অবিদিত। যে পাপ লোকে জানে, সে পাপ বিদিত। সে পাপের রাজদণ্ড আছে, প্রায়শ্চিত্তও আছে। যে পাপ আর কেহ জানে না, সেই অবিদিত পাপ অন্যের নিকট খ্যাপন করিতে হইবে। সংসারে একমাত্র মাতা আছেন, যাহাঁর নিকট পুত্র নিজকৃত পাপ স্বীকার করিতে পারে। কারণ, "কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কদাপি নয়"। গঙ্গা মাতৃস্বরূপা মনে করিয়া তাঁহার নিকট পাপ স্বীকার করিতে হইবে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপখ্যাপনের (কন্‌ফেশন) বিধি আছে। এক পাদরী এক নিভৃতগৃহে পাপস্বীকার শুনেন। উভয়

৫

স্থলে উদ্দেশ্য একই। কিন্তু নারী পরপুরুষের নিকটে কৃতপাপ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারে কি না সন্দেহ।

পাপ ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানস। অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ (চুরি), অবৈধ হিংসা, পরদারোপসেবা, এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ। পারুষ্য, অনৃত বচন, পৈশুন্য (অন্যের অর্থহানির নিমিত্ত দোষখ্যাপন), অসম্বন্ধ প্রলাপ, এই চতুর্বিধ বাচিক পাপ। পরদ্রব্যে লোভ, অপরের অনিষ্ট-চিন্তা ও অসত্যে অভিনিবেশ, এই ত্রিবিধ মানস পাপ। সেদিন কেবল গঙ্গার নিকট পাপখ্যাপন নয়, অনুতাপ করিতে হইবে; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও দান করিতে হইবে। তপস্যার স্থানে উপবাস বিহিত হইয়াছে।

গঙ্গার জন্ম

পুরাণে ও রামায়ণে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গ হইতে গঙ্গাবতরণের কথাও আছে। গঙ্গা দুইটি। একটি স্বর্গে, স্বর্গঙ্গা; অপরটি পৃথিবীতে, ভাগীরথী। স্বর্গঙ্গা ছায়াপথ। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পর পূর্ব আকাশে স্বর্গঙ্গার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় উত্তর বিন্দু হইতে দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত একটি দুগ্ধবর্ণ বলয়ার্ধ উঠিতে দেখা যায়। ইহা বিষ্ণুগঙ্গা। (অপরার্ধ অগ্রহায়ণ মাসে, ইহা শিবগঙ্গা)। উদয়ের নাম জন্ম। এই অর্থ বহু প্রাচীন। এই অর্থে প্রত্যহ সূর্যের জন্ম হয়। এই বলয়ার্ধের উত্তর সীমার একটু দূরে ধ্রুবমৎস্য নক্ষত্র। ইহার চারিদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এই হেতু গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা। দক্ষিণে উজ্জ্বল আলোহিত জ্যেষ্ঠা তারা দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই স্বর্গঙ্গার উদয় হেতু জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা কল্পিত হইয়াছে। মনে করিতে হইবে, জগন্নাথদেব মন্দাকিনীতে স্নান করিতেছেন।

কিন্তু আমরা স্বর্গের মন্দাকিনী পাই না। তাহারই তুল্য পবিত্র ভূ-গঙ্গা পাইতেছি। আমরা ভারতভূমিকে মাতা বলি। সেইরূপ গঙ্গাও মাতৃস্বরূপা। এক উপাখ্যান আছে, ভগীরথ স্বর্গ হইতে এই গঙ্গা মর্ত্যে আনিয়াছিলেন! এখানে দুইটি উপাখ্যান মিশ্রিত হইয়াছে।

একটি স্বর্গের গঙ্গার, অপরটি মর্ত্যের। ভগীরথ পার্থিব গঙ্গার স্রোত ধরিয়া সমুদ্র পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই গঙ্গা-আনয়নের উপাখ্যানে দুইটি বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছায়াপথের দীপ্তির কারণ কি? কবি বলিতেছেন, সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তারকা হইয়া স্বর্গঙ্গা উৎপন্ন করিয়াছেন। কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে সগরসন্তানগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। জাহ্নবীর জলস্পর্শে তাঁহারা স্বর্গে তারকা হইয়াছিলেন।

ভগীরথ রাজমহল পর্যন্ত আসিয়া সমুদ্র পাইয়াছিলেন। রাজমহল পাহাড়ে আগ্নেয়গিরি ছিল। এখনও তাহার চিহ্ন আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডও তাহার আর এক প্রমাণ। উপাখ্যানে, সেখানেই কপিল মুনির আশ্রম ছিল। তৎকালে গঙ্গার মুখে একটা দ্বীপ জন্মিয়াছিল। সেখানে জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। সেই দ্বীপ বর্তমান মালদহ। জোয়ারের জলে সে দ্বীপ ডুবিয়া যাইত। জহ্নুমুনির আশ্রমও ডুবিত। তিনি ভগীরথের গঙ্গা পান করিয়া ফেলিলেন, পরে ভাগীরথের স্তবে প্রীত হইয়া মুনি মালদহের দুই দিক দিয়া দুই স্রোত করিয়া দিলেন। মালদহ নামের অর্থ, যে দহ মাল (উচ্চ) হইয়াছে। নদীর মুখে দ্বীপ হইলে প্রবাহে বাধা পড়ে, কোলের দিকে শাখা বাহির হয়। সেই শাখা বঙ্গে ভাগীরথী।

কতকাল পূর্বের ঘটনা? তাহার মোটামুটি হিসাব করিতে পারা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সূর্যবংশীয় রাজা বৃহদ্‌বল নিহত হইয়াছিলেন। ভগীরথ তাঁহার পূর্বপুরুষ। উভয়ের মধ্যে বাহান্ন পুরুষের ব্যবধান। বাহান্নপুরুষে ১৩০০ বৎসর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দে। অতএব ভগীরথ খ্রী-পূ (১৪৪১+১৩০০=) ২৭৪১ অব্দে ছিলেন। অতএব প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে মধ্যবঙ্গ জলময় ছিল। অসম্ভব নয়।

ইন্দ্রপূজা

উপরে পাইয়াছি, এককালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-নবমীতে মহাবিষুব হইয়াছিল। ইহার ৩ মাস ৩ তিথি পরে, অর্থাৎ ভাদ্র শুক্ল-দ্বাদশীতে

রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সে তিথির নাম বামন-দ্বাদশী। সেদিন ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ইন্দ্র-ধ্বজ-রোপণ নামক বৃহৎ উৎসব হয়। সে দিন রাজা অমাত্য ও প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘ ধ্বজ রোপণ করেন। ধ্বজের শীর্ষে এক দীর্ঘ পতাকা থাকে। কোন্ দিন রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে, তাহা ধ্বজের ছায়া দ্বারা এবং বায়ু-প্রবাহের দিক্ পতাকা দ্বারা নির্ণীত হইত। বহুকাল পূর্বে চেদী দেশের রাজা উপরিচর-বসু এই উৎসব প্রবর্তিত করিয়া ছিলেন। অদ্যাপি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নামক স্থানে এই ইন্দ্রপূজা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। পাঁজিতে ইহারই নাম শক্রোত্থান লিখিত হইতেছে। বিবাহের পূর্বে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সময়ে গৃহ-ভিত্তিতে ঘৃতের 'বসুধারা' করা হয়। অভিপ্রায় এই, বিবাহের ফলস্বরূপ সন্ততিবর্গও যেন ধারার তুল্য বর্ধিত হয়। উপরিচর-বসুর নামানুসারে এই ধারার নাম বসুধারা।

বারুণী

বারুণী-স্নানও বহুফলজনক। সেদিন অমান্ত ফাল্গুন-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন। শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি বরুণ। এই হেতু শতভিষার এক নাম বারুণী। পরিশিষ্টে প্রদত্ত গণিতকর্ম দ্বারা পাইতেছি, সেদিন রবি উত্তর-ভাদ্রপদা নক্ষত্রে থাকেন। প্রচলিত দোলযাত্রার দিন রবি পূর্ব-ভাদ্রপদায় থাকেন। রবি ভাদ্রপদা নক্ষত্রে আসিলে পূর্বকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সেদিন ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত। ফল্গুনী দুইটি, ভাদ্রপদাও দুইটি। বর্তমান প্রচলিত দোল-যাত্রার দিন রবি পূর্ব-ভাদ্রপদা নক্ষত্রে থাকেন এবং চন্দ্র পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণ হয়। অতএব যে সময়ে পূর্ব-ফল্গুনীতে রবি আসিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত, এই দোলপূর্ণিমা তাহারই স্মৃতি। বারুণী ইহার এক নক্ষত্র পূর্বের, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতি। আরও সহজে বারুণীর উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়। দোল-পূর্ণিমার ১৩ তিথি পরে বারুণী। ১৩ তিথিতে চন্দ্র প্রায় এক নক্ষত্র অতিক্রম

করেন। অতএব, দোলপূর্ণিমার সময় হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতি বারুণীতে পালিত হইতেছে।

কোজাগরী পূর্ণিমা

উপরে দেখিয়াছি, ভাদ্র-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, অর্থাৎ সেদিন অম্বুবাচী হইত। ভাদ্র-পূর্ণিমা হইতে আশ্বিন-পূর্ণিমা এক মাস। অতএব আশ্বিন মাস বর্ষার প্রথম মাস ছিল। ভাদ্র-পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইবার অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রী-পূ ৪৫০০+২০০০=৬৫০০ অব্দে, আশ্বিন-পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইয়াছিল। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা তাহারই স্মৃতি। এই কাল অন্য প্রকারেও পাইতে পারি। আশ্বিন-পূর্ণিমার দিন রবি অশ্বিনী হইতে চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চাতে অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রে অবশ্য থাকেন। অতএব পূর্বকালে চিত্রানক্ষত্রে রবি আসিলে দাক্ষিণায়ন হইত। বর্তমানে রবি আর্দ্রায় আসিলে দক্ষিণায়ন হইতেছে। আর্দ্রা হইতে চিত্রা নবম নক্ষত্র। অয়ন এক এক নক্ষত্র পিছাইতে প্রায় সহস্র বৎসর লাগে। অতএব অদ্যাবধি আট-নয় সহস্র বৎসর পূর্বের স্মৃতি পাইতেছি।

লক্ষ্মীদেবী বেদের ইলা বা ইড়া। অম্বুবাচী দিবসে তাঁহার জন্ম হইত। রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণ হইতে এক উপাখ্যান তুলিয়াছেন। "নিকুম্ভনামে এক রাক্ষস যুদ্ধ করিয়া সেনার সহিত সেদিন বালুকা-সাগর হইতে আসে।" এই বালুকাসাগর নিশ্চয় শুভ্র বালুকাসাগর, ছায়াপথ। পুরাণে আছে, রাক্ষসেরা সাগর কিম্বা বিস্তীর্ণ জলরাশির নিকট বাস করিত। নিকুম্ভের সাগরও নিশ্চয় জলরাশি। আর সে জলরাশি স্বর্গঙ্গা। ইহারই নামান্তর ক্ষীরোদ সাগর। সে অপূর্ব কাহিনী ঋগ্‌বেদে আছে। সেখানে রাক্ষস নাই, অসুর আছে। ইন্দ্র সেই অসুরের সহিত অম্বুবাচীর দিন যুদ্ধ করিতেন। কোজাগরী পূর্ণিমাতে অম্বুবাচী হইত। এই কথাই পুরাণকার উপাখ্যানে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই হেতু কোজাগরী লক্ষ্মীকে চারি দিক-হস্তী স্নান করায়। সেদিন অরন্ধন; এই হেতু চিপিটক-নারিকেল-ভক্ষণ বিহিত।

মহালয়া ও দীপালী

এ পর্যন্ত আমরা পূর্ণিমাই দেখিয়া আসিতেছি। অমাবস্যাতেও অনেক কৃত্য আছে। বিশেষতঃ সেদিন পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বিহিত। যে বৎসর ভাদ্রপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হয়, তাহার চতুর্থ বর্ষে অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন হইবে। কারণ বর্ষে বর্ষে ১১·০৬ তিথি বৃদ্ধি হইয়া চতুর্থ বর্ষে ৪৪·২৪ তিথি হয়; অর্থাৎ একমাস ও একপক্ষ গতে অমাবস্যা আসে। অতএব, যেকালে ভাদ্রপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, সেকালে ভাদ্র-অমাবস্যাতেও হইত, কেবল চারি বৎসরের অন্তর। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন, পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ মৃত্যুর পরেই উচ্চ স্বর্গে গমন করেন ও দেবতাদের সহিত দেবলোকে বাস করেন। দেবলোক সদা আলোকময়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে স্বর্গবাস হয় না। তাহাঁরা দক্ষিণে অন্ধকার যমলোকে গমন করেন ও সেখানে বাস করেন। এই কারণে দক্ষিণ দিকে পা রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ। দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার পথ আছে। ধ্রুব ও দক্ষিণায়নাদি বিন্দু এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া সেই রেখা বর্ধিত করিলে, সেই রেখাই সে পথ। এই পথের নাম পিতৃযান। ইহা উত্তরে পিতৃলোকে যাইবার পথ। এইরূপ দেবলোকে যাইবার একপথ আছে। ধ্রুব ও উত্তরায়নাদি বিন্দুর যোগরেখা বর্ধিত করিলে সে পথ হয়। ইহা দেবযান। কুরুকুলপতি ভীষ্ম দেবযান পথ পাইবার নিমিত্ত ৫৮ দিন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। অয়নাদি বিন্দু ক্রমশঃ পশ্চিমগামী হইতেছে, এই দুই পথও স্থান পরিবর্তন করিতেছে। এককালে ছায়া-পথের এক অর্ধ পিতৃযান হইতে পারিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে সে অর্ধের উদয় হয়। সেই ঘটনা হইতে সে পথের নাম বৈতরণী হইয়াছিল।

অমান্ত ভাদ্রঅমাবস্যা মহালয়া। সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃ-গণকে দীপ দেখাইতে হয়। অন্ধকার যমলোক হইতে তাহাঁরা পিতৃযান-পথে মহা-আলয়ে গমন করেন। এই কারণে মহালয়া দীপান্বিতা অমাবস্যা। অবিকল সেই কারণে আশ্বিন-অমাবস্যা দীপান্বিতা। সেদিন দীপালী। সেদিনও লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। বঙ্গের গ্রামবাসী জানে, কেন সেদিন দীপদান ও ইঁজল-পিঁজল করে। পশ্চিম ভারতে

যেমন গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশের লোকে জানে না। তাহারা কার্ত্তিক-শুক্ল প্রতিপদে নূতন বৎসর গণে। এই কারণে মনে করে, দীপালী নববর্ষের পূর্ব রাত্রির উৎসব। যেকালে আশ্বিনপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত (অমান্ত) আশ্বিনঅমাবস্যাও সেই কালের। খ্রী-পূ ছয় সহস্র বৎসর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, কোন্ অতীত কালের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন!

আমি বুঝিতেছি, অনেক পাঠক এই প্রাচীনতা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তাঁহারা শুধাইবেন, আর্যেরা কি আট সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতখণ্ডে আসিয়াছিলেন? আর আশ্বিন মাসের শেষ দিকে বর্ষা নামিতে দেখিয়াছিলেন? অসম্ভব! আরও দশ-পনর সহস্র বৎসর পূর্বে কি হইয়াছিল, তাহা গণিত দ্বারা বলিতে পারি। কিন্তু গণিত দ্বারা বাস্তব প্রমাণিত হয় না। ঋগ্‌বেদের কালে ভাদ্র-আশ্বিন ইত্যাদি মাস নামই ছিল না।

আমি এখানে সম্পূর্ণ নূতন বৃত্তান্ত শুনাইতেছি; পাঠকের সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি দেখিবেন, প্রত্যেক স্থলে প্রথমে তথ্য দিয়াছি। পরে তাহা হইতে কাল অনুমান করিয়াছি। কুত্রাপি গণিত দ্বারা তথ্য আনি নাই। পুনর্বার লিখিতেছি।

(১) বিষ্ণুপুরাণে (২।৮।৭১) ও বায়ুপুরাণে আছে, মেষান্তে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইয়াছিল। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেষের আদিতে হইত। আমরা অদ্যাপি তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছি। এখন গণিত আসিতেছে। কত বৎসর পূর্বে মেষান্তে মহাবিষুব হইত? কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রী-পূ ১৮৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে হইত। দেখিয়াছি, এই সময়ের পরে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাস ও ঝুলনের দিনের হেতু মিলিয়াছে।

(২) কৃষ্ণ যজুর্বেদে অভিজিৎ লইয়া ২৮ নক্ষত্রের নাম আছে। এই সকল নক্ষত্র তারাময় প্রত্যক্ষ নক্ষত্র, নক্ষত্র-ভাগ নয়। ইহা হইতে এবং অন্য দুই তিন প্রমাণ হইতে পাইতেছি, যজুর্বেদের কাল খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তী। সে সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত। জিজ্ঞাসু পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, ৪৬ বর্ষ)

প্রকাশিত "বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে যজুর্বেদের কাল", এই প্রকরণ পড়িতে পারেন।

(৩) ইহার পূর্বে ঋগ্‌বেদের কাল চলিয়াছিল। আমরা ইহার আদি জানি না, কিন্তু মধ্য ও অন্ত জানি। এখানে বৈদিক গ্রন্থ হইতে তথ্য বিচার অসম্ভব। কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণ সুবোধ্য। পূর্বে দেখিয়াছি, এই সময়ের খ্রী-পূ ৪৫০০ হইতে ৩৫০০ অব্দের মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। এই হেতু অগ্রহায়ণ মাস শরৎঋতুর প্রথম মাস হইতে পারিয়াছিল। পুরাণে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা ও দশহরার দিন পাইয়াছি। একটা কথা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। জ্যেষ্ঠা এক নক্ষত্রের নাম কেন হইল? নিশ্চয় ইহা নক্ষত্র-চক্রের প্রথমে ছিল। জ্যেষ্ঠার পর মূলা। এই নক্ষত্রের নামও পুরাকালের সাক্ষী। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে জ্যেষ্ঠার পশ্চিমে চতুর্দশ নক্ষত্রে অর্থাৎ রোহিণীতে সূর্য থাকিতেন। তৎকালে রোহিণী, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি নক্ষত্র তারাময় আকৃতি বুঝাইত। ইহা হইতে গণিতক্রমে খ্রী-পূ ৩২৫০ অব্দে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ও খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠশুক্লাদশমীতে মহাবিষুব পাইয়াছি।

(৪) যদি খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত; অতএব আশ্বিনপূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত। ইহা হইতে পাইতেছি, অশ্বিনীর চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চিমে চিত্রা নক্ষত্রে রবি আসিলে দক্ষিণায়ন হইত। এখন আর্দ্রা প্রবেশে দক্ষিণায়ন হইতেছে। আর্দ্রা ৬, চিত্রা ১৪ নক্ষত্র : ৮ নক্ষত্রের ব্যবধান। অতএব এখন হইতে অন্ততঃ ৮ সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। পুরাণে ইহার প্রমাণ, আশ্বিনী পূর্ণিমায় কোজাগরী ও আশ্বিনঅমাবস্যায় দীপালী পাইতেছি। ঋগ্‌বেদে এই কালের প্রমাণ অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে অশ্বিনী ও চিত্রার নামগন্ধও নাই। নক্ষত্রগুলা আছে, অন্য নামে আছে। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পান, যাঁহার বর্ণজ্ঞান হইয়াছে তিনি পড়িতে পারেন। যে অন্ধ সে কী দেখিবে। যে বধির সে কী শুনিবে। ভারতের অতীত প্রত্যক্ষ হইয়া কথা কহিতেছেন। পুরাণ পুরাবৃত্ত। পুরাণকার যাহা

দেখিয়াছিলেন, যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, কি সুকৌশলে পুরাণকার জনসাধারণের মনে ধর্মভাব জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদের পুরাতন ইতিহাস রক্ষা করিয়াছেন!

দ্বিতীয় খণ্ড

দুর্গোৎসব

১

দুর্গোৎসব-প্রশ্ন

বহু বিজ্ঞ জনে দুর্গাপূজার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিজয়া দশমীর শবরোৎসব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির একটি উৎসব মার্জিত হইয়া দুর্গাপূজায় পরিণত হইয়াছে। কেহ নবপত্রিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, শরৎকালে আশুধান্য সংগ্রহ হয়, দুর্গাপূজা নবান্নের উৎসব। কাহারও মতে বসন্তাগমে আমরা যেমন বসন্তোৎসব করি, শরৎঋতু দেখিয়া তেমন শরদুৎসব করি। এইরূপ, যিনি দুর্গোৎসবের যে অঙ্গ দেখিয়াছেন, তিনি অন্ধের মতন হস্তী-দর্শন করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইতে দুর্গাপূজার পূর্বে ভক্ত ও ভাবুক দেবীর পুরাণোক্ত মহিমা কীর্তন করিতেছেন। কোন কোন পণ্ডিত বৈদিক গ্রন্থে ও পুরাণে দেবীর নামোল্লেখ প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা দেবী-কল্পনার প্রাচীনতা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু দুর্গাপূজা ও উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ পাইতেছি না।

বাস্তবিক প্রশ্নটি সোজা নয়। দুর্গাপূজা ও তৎসম্পৃক্ত উৎসব, এই দুই অঙ্গের উৎপত্তি ও প্রকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। ইহাদের আনু-পূর্বিক ইতিহাস সঙ্কলন দুঃশক্য। কারণ আমাদের অধিকাংশ পূজায় বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত আছে। সে প্রাচীন যে কোন্ অতীত কালের সাক্ষী, কোন্ মানব-চিত্ত-বৃত্তির বাহ্য প্রকাশ, তাহা বলিবার উপায় নাই। কালে কালে দেশে দেশে পূজা-পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন অনুষ্ঠান গিয়াছে, নূতন আসিয়াছে, তথাপি নূতনে পুরাতনের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। কারণ মানবের স্বভাব এই, নূতন কিছু করিতে হইলে পুরাতনকে আশ্রয় করে।

দেবীর পূজার উৎপত্তি ও স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে পূজা-প্রকরণ অনুধাবন কর্তব্য। কিন্তু পূর্বকালের পূজা-পদ্ধতি কিছুই জানা নাই। এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। যথা—

(১) আশ্বিন শুক্ল নবমীতে ষোড়শোপচারে সমারোহে দেবীর পূজা বিহিত, কিন্তু পূজারম্ভের কয়েকটি দিন আছে। তবে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য কেন? ভাদ্র কৃষ্ণ-নবমী, আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী হইতে পূজা আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দিনে পূজারম্ভের হেতু কি? কেবল অষ্টমীতে, কেবল নবমীতে পূজা করা যাইতে পারে। এত দিনের মধ্যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী মাত্র এই তিন দিন প্রতিমার পূজা হয়। অধিকাংশ গৃহে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দিনে জলপূর্ণ ঘটে দেবীর পূজা হয়। জলপূর্ণ ঘট, মুখে আম্র-পল্লব, কিসের দ্যোতক? ঘটে পটে প্রতিমায় দেবীর পূজা করা যাইতে পারে। যদি ঘটে পূজা সিদ্ধ হয়, প্রতিমার প্রয়োজন থাকে না। ষষ্ঠীর সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে, তদভাবে যুগ্মফলযুক্ত বিল্ব-শাখায় দেবীর বোধন এবং আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। ইহার অর্থ কি? তবে কি প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত পূজা বৃথা হইতেছিল? বোধন শব্দের অর্থ কি? দেবীকে জাগরিত করা? তিনি কি এত দিন নিদ্রিত ছিলেন? নিদ্রা হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী জগজ্জননী তাঁহার নিদ্রায় প্রলয় হয়। বোধন সময়ে বিল্ববৃক্ষে পূজা করিতে হয়। বিল্ব-বৃক্ষ অম্বিকার প্রিয়। ইহার কারণ কি? আরও, বিল্ববৃক্ষের সমীপে নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। নাম নবপত্রিকা, কিন্তু নয়টি বৃক্ষের পত্র না হইয়া নয়টি বৃক্ষ কিম্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা শ্বেত অপরাজিতার লতা দ্বারা বাঁধিয়া স্থাপন করিতে হয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই—রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান্য। নব পত্রিকার অর্থ কি? বাঁকুড়ায় কেহ কেহ প্রতিমায় পূজা না করিয়া নবপত্রিকায় পূজা করেন। অতএব মনে হয়, নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। তাহা হইলে প্রতিমার প্রয়োজন কি? নবদুর্গাই বা কি? বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা স্থাপনের নিমিত্ত চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পৃথক্ এক স্থানে সূত্র-বেষ্টনদ্বারা এক বস্ত্রগৃহ নির্মিত হয়। ইহারই বা হেতু কি? এই গৃহে অলক্তক, সূত্র ও ছুরিকা রাখা হয়। এ সকলের প্রয়োজন কি? সপ্তমীতে নবপত্রিকা চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক বৃক্ষ

পূজিত হয়। নবমীতে পূজার সময় ছাগ বলিদানের পূর্বে (কোথাও পরে) ইক্ষু ও কুষ্মাণ্ড বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পশুবলির সহিত এই দুই উদ্ভিদের বলি বিসদৃশ নয় কি?

কালিকা-পুরাণে নরবলির ব্যবস্থা আছে। সে লোমহর্ষণ ব্যাপার পড়িলে আমাদের হৃৎকম্প হয়। কিন্তু দেবীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নরবলি শ্রেষ্ঠবলি গণ্য হইত। শত্রুরাজ্যের রাজপুত্রকে পাইলে উত্তম। অভাবে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর উচ্চজাতির যুবককে কয়েকদিন উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া দেবীর প্রীত্যর্থে বলি দেওয়া হইত। শুধু দুর্গাপূজায় কেন, কাপালিকেরাও নরবলিদ্বারা অভীষ্টলাভের আশা করিত। সেই নরবলির স্মৃতি অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে এবং কলিকাতাতেও রক্ষিত হইতেছে। কোথাও পিটালীর, কোথাও ঘনীভূত ক্ষীরের, কোথাও ময়দার নরশিশু নির্মাণ করিয়া বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম শত্রুবলি।* কলিকাতার এক ধনাঢ্য বৈষ্ণব কায়স্থ গৃহে পশুবলি দেওয়া হয় না, কিন্তু ক্ষীরের শত্রুবলি দেওয়া হয়। বলিপ্রদত্ত নরের মাংস মহামাংস। দেবী মহামাংসে ও সুরায় সম্যক্ প্রীত হন। লোকে জানে না, কুষ্মাণ্ড নরবলির পরিবর্ত। এই কারণে পূর্ববঙ্গে বিধবারা কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করেন না। ইক্ষু হইতে গুড় এবং গুড় হইতে গৌড়ী মদ্য হয়। ইক্ষু সুরার প্রতীক।

কুমারীপূজা দুর্গাপূজার এক বিশেষ অঙ্গ। কুমারীপূজার হেতু কি? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উদিত হয়।

উৎসব. সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে। দুর্গাপূজার পূর্বে পথ-ঘাট গৃহ পরিষ্কৃত, চণ্ডীমণ্ডপে বনমালা লম্বিত, মণ্ডপের দুই পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ রোপিত হয়। পুরাকালে ধ্বজা উত্তোলিত হইত। বহুকাল হইতে আর হয় না। নববস্ত্র পরিধান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ। আমরা

---

* পূর্ববঙ্গে দুর্গাপূজায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, এই তিন দিন ছাগ, মহিষ, ইক্ষু, কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। নবমীর দিন ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা পিটালীর নরমূর্তি নির্মাণ করিয়া মানকচুর পাতায় মুড়িয়া হাড়িকাঠে চাপাইয়া বলি দেয়া হয়। এই নরমূর্তির বলির নাম শত্রুবলি।

লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা করি, কিন্তু তদুপলক্ষ্যে নববস্ত্র পরিধানের রীতি নাই। স্থানবিশেষে শ্যামাপূজার সময় ও বিষ্ণুর দোলযাত্রার সময় নববস্ত্র পরিধানের বিধি আছে। দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জনের পর নদীতে কিম্বা তড়াগে দেবীর প্রতিমা, বিল্বশাখা ও নবপত্রিকা নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জল ও কাদা পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করা হয়। আর, সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষা প্রয়োগদ্বারা শবরোৎসব হয়। ইহা উৎসবের এক অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ে জল-কর্দম নিক্ষেপ ও ক্রীড়া-কৌতুক আছে, কিন্তু অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ কখনও শুনি নাই। বোধহয় পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। শবরক্রীড়ার পর গৃহে আসিয়া গুরুজনকে প্রণাম, বন্ধুজনের পরস্পরের কুশল-সম্ভাষণ ও সকলের সিদ্ধিপানের ব্যবস্থা আছে। এখানে জিজ্ঞাস্য, অন্য দেবীর পূজায় শবরোৎসব হয় না, সিদ্ধি পানও হয় না। দুর্গোৎসবে হয় কেন? দশমীতে দেশীয় রাজ্যে নীরাজন হয়। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মার্জিত, তৈললিপ্ত, অশ্ব-গজাদির গাত্র ধৌত, অলঙ্কৃত, পদাতি রণ-সজ্জায় ভূষিত হয়। মন্ত্রদ্বারা তাহাদের পূজা হয়। অপরাহ্নে রাজা কিম্বা সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা করেন। সে দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে পরে আবশ্যক কালের যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

সিংহ-বাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী রণচণ্ডী রূপে দশভুজার পূজা হয়। প্রতিমায় যে বীর ও রৌদ্র রস প্রকটিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে বাৎসল্য রসে পরিণত হইয়াছে। কবে হইতে এবং কেন চণ্ডী শিবের ঘরণী হইলেন, বঙ্গের ইতিহাসবেত্তারা অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। যজমান গৃহী ও গৃহিণী মনে করেন, পার্বতী উমা পিতৃগৃহে তিন দিন আসিয়াছেন। তিন দিন থাকিয়া কন্যা শ্বশুর-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহিণী কন্যাকে নির্মঞ্ছন* করেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, আর বলেন, মা, আসছে বছর আবার এসো। পাঁজিতে দুর্গা-

---

* লোকে বলে, বরণ। কিন্তু বিসর্জনকালে বরণ হইতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যে "নিছিয়া ফেলিল পান" সেই কর্ম। আমান্ন ভোজ্য তাম্বূল প্রভৃতি দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ধরিয়া প্রতিমার পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। সং মঞ্ছ ধাতু পূজায়। কেহ কেহ নির্মঞ্ছন বলেন। কিন্তু মঞ্ছ ধাতু আছে কি?

প্রতিমার চিত্রে শিবের অনুচর নন্দীকে মেলানি মোট বাঁধিতে দেখা যায়। এসব কোথা হইতে কবে আসিল?

মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীষ্ম পর্বে, দুই স্থানে দুর্গার স্তব আছে। মহাভারতে এই দুই স্তব প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত হয়। প্রক্ষিপ্ত হউক, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। সেই দুই স্তব পাঠ করিলে আরও অনেক প্রশ্ন উদিত হয়। কিছু কিছু তুলিতেছি। যথা—বিরাট পর্বের ৬এর অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "হে যশোদা-নন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনি, কংসধ্বংসকারিণি কৃষ্ণে, হে বালার্কসদৃশে চতুর্বক্তে! বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান।" দুর্গা যশোদা-গর্ভসম্ভূতা, ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও অন্য পুরাণেও আছে। ইনি কংসাসুর বধ করিয়াছিলেন? দুর্গার এক নাম বিন্ধ্যবাসিনী কেন হইল? কিন্তু সেইখানেই আছে, কংস তাঁহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনি আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম-পর্বে ২৩-এর অধ্যায়ে অর্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে স্তব করিতেছেন, "হে গোপেন্দ্রানুজে, নন্দগোপকুলসম্ভবে, কোকমুখে! তুমি জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর। হে কান্তার-বাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হই।"। দুর্গা চতুর্মুখা। ব্রহ্মা চতুর্মুখ। কারণ চারি বেদ তাঁহার মুখ-কমল হইতে নির্গত হইয়াছে। মহেশ্বর মহাকাল, চতুর্যুগ নিরীক্ষণ করেন। দুর্গা কালী, তাঁহারও চতুর্মুখ হইতে পারে। কিন্তু এমন প্রতিমা দেখিতে পাই না। দুর্গা কোকমুখা। কোক, বন্য-কুক্কুর। দুর্গার মুখ কুক্কুরের তুল্য। শিবা শব্দে দুর্গা ও শৃগালী বুঝায়। ইহার কারণ কি? তিনি থাকেন কোথায়? কান্তারে জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষ সন্নিধানে। জম্বুগাছ জামগাছ, কটক—কতক, অরিষ্ট—নির্মলী ফলের গাছ। চৈত্যবৃক্ষ অশ্বত্থ বোধ হয়। দুর্গা ও কালী স্বরূপতঃ একই। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে শ্মশান-কালীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে মূর্তি নাই, নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্মশানকালী নাম আছে। বোধ হয় কান্তারে ঐ সকল বৃক্ষের সমীপস্থ কালী পরে শ্মশান-কালী নাম পাইয়াছেন। বাঁকুড়া রাইপুরে দুর্গার

কোকমুখা পাষাণময়ী মূর্তি পূজিত হইতেছে। পূর্বে এক বৃক্ষ-মূলে ছিল, এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। কোন্ প্রদেশে এই দুই স্তব রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মহাভারতে বনপর্বে ২২৯-এর অধ্যায়ে আরও আশ্চর্য কথা আছে। দুর্গা মহিষাসুর বধ করেন নাই, কার্তিকেয় করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধের মীমাংসা করিতে গিয়া পুরাণ-কারেরা বলেন, কল্পান্তরে দেবী নানা মূর্তি ধারণ করিয়া নানা অসুর বধ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কল্পান্তর সামান্য কথা নয়। ব্রহ্মার এক দিনের নাম কল্প। ব্রহ্মার সৃষ্টি যত কাল থাকে তত কাল। এক সৃষ্টি লয় পাইয়া আর এক সৃষ্টি আরম্ভ হইলে কল্পান্তর বলা যায়। আমরা দুই-চারি শত বর্ষের কথা স্মরণ রাখিতে পারি না। কল্পান্তরে কি হইয়াছিল কে জানিতে পারে? বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশে দুর্গার কীর্তির সম্বন্ধে যেসকল কাহিনী প্রচলিত ছিল পুরাণ-কারেরা সেসকল স্ব স্ব বুদ্ধি ও কল্পনাবলে লিখিয়া গিয়াছেন। পরে স্মার্ত ভট্টাচার্যেরা পূজা-পদ্ধতিও দুর্গামাহাত্ম্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কালী-ও দুর্গা-পূজায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। শাস্ত্রকারেরা দেবী পূজায় এই অধিকার দিয়াছেন, একথা বলিতে পারা যায় না। সঙ্কটকালে ও যুদ্ধোদ্যমে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অধিক কালের কথা নয়, ডাকাতেরা কাটারীতে কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বাঙ্গালী কালীপূজা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে কেরল দেশে কালীপূজা বহু প্রচলিত আছে। এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে কালীপূজা ও তৎসম্পর্কে উৎসব হয় না।*

---

* *Kali Cult in Kerala*—Bulletin No. 4 of the Sri Rama Varma Research Institute, Cochin, 1936 এই প্রবন্ধে অনেক মালয়লী শব্দ আছে, সমুদয় বিবরণ বুঝিতে পারা যায় না। ইহার পরে ১৯৪৩ সালে *Kali Worship in Kerala* by Dr. C. Achyuta Menon M.A., Ph.D. Published by the Madras University, English Translation of the Original Malayli Text বাহির হইয়াছে। আমি দেখি নাই। কেবল

ভারতের পূর্বোত্তর অংশে আসামে ও বঙ্গদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরলে একই দেবীর পূজায় প্রায় একই প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু আসাম বিহার ও বঙ্গ ব্যতীত আর কুত্রাপি মৃণ্ময়ী দশভুজার পূজা হয় না। ইহারই বা হেতু কি?

দুর্গাপূজার পদ্ধতিতে অনেক দেশাচার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও দুর্গোৎসবতত্ত্ব লিখিয়াছেন। তিনি চারি শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। তিনি কোন কোন বিধানের পৌরাণিক প্রমাণ তুলিতে পারেন নাই। সে সে স্থলে ইহাই আচার বলিয়াছেন। দেশাচারের উৎপত্তি নির্ণয় দুঃসাধ্য। দেশাচার ব্যতীত কুলাচার আছে। প্রসিদ্ধ পুরোহিত-বংশের এক এক দুর্গাপূজার পদ্ধতির পুথী আছে। তদনুসারে পুরোহিত যজমানের দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। সপ্তমীতে পশুবলির বিধান নাই। কিন্তু কোন কোন বাড়ীতে ছাগবলি হইয়া থাকে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম এত প্রচলিত করিয়াছিলেন যে দুর্গাপূজায় পশুবলি উঠিয়া গিয়াছে। এক কায়স্থ জমিদার-বাড়ীতে বস্ত্রাচ্ছাদিত নবপত্রিকার উপর একটি মৃণ্ময় নারীমুণ্ড বদ্ধ হয়, এবং নবপত্রিকা দুর্গারূপে পূজিত হয়, পশুবলি হয় না। কিন্তু অন্ন ও মাগুর মাছের ঝোল ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্যের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। ধাতু-নির্মিত দশভুজা প্রতিমা আছে। তদুপরি একটি মৃণ্ময় নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়, প্রতিমা বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। ইহার নাম মুণ্ডপূজা। পশুবলি নাই, কিন্তু বিসর্জনের সময় পান্ত-ভাত ও পোড়া চেং মাছ জামিরের রস ও নুন মাখিয়া ভোগ দেওয়া হয়। কন্যা পতি-গৃহে যাইতেছেন, অন্ন ভোজন করিয়া যাইবার রীতি নাই, তিনি দই ও মুড়কির ফলার করিয়া যান। এইরূপ নানা স্থানে নানাবিধ কুলাচার পূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

বই-পড়ায় ব্যাপার সম্পন্ন হইবে না। কালীপূজায় অভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালী কেরল দেশে গিয়া পূজা ও উৎসব দেখিয়া দুই দেশের অনুষ্ঠান মিলাইলে বঙ্গের ইতিহাসের একটা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। কেরলের কালীপূজায় তান্ত্রিকমন্ত্র কোথা হইতে গিয়াছে? কেরলীয়ের সহিত বাঙ্গালীর আরও সাদৃশ্য আছে।

প্রতিমা-নির্মাণেও দেশাচার প্রবল হইয়াছে। রাঢ়দেশে সূত্রধর প্রতিমা-নির্মাণ করে। কারণ সূত্রধর সেকালের ইঞ্জিনীয়র। প্রতিমা-নির্মাণে মাপ-জোখের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গে কুম্ভকার এবং পূর্বদিকে মৈমনসিং ও ত্রিপুরায় গ্রহাচার্য প্রতিমা-নির্মাণ করেন। প্রতিমা-নির্মাণ শিল্পকর্ম। বিশ্বকর্মার পূজা না করিলে শিল্পকর্মে অধিকার জন্মে না। শাস্ত্রজ্ঞান, কর্মাভ্যাস ও ধ্যান, এই তিনের যোগে প্রতিমা-নির্মাণ সার্থক হয়।

বঙ্গদেশে মৃণ্ময়ী দশভুজার পূজা অধিক পুরাতন মনে হয় না। যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা শূলপাণি কৃত "দুর্গোৎসব বিবেক" নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। শূলপাণি বঙ্গীয় নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি চতুর্দশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই শতাব্দে ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বে বঙ্গীয় ভবদেব ভট্ট দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তিনি কতিপয় পূর্ববর্তী স্মৃতি-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গার প্রতিমা পূজার লিখিত নিদর্শন দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দের সেদিকে পাওয়া যায় নাই। এই পূজা কোথা হইতে আসিল?

নিবন্ধ থাকিলেও দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত ছিল না। লোকবল ও ধনবল না থাকিলে এই পূজা সম্পন্ন হইতে পারিত না। ইহার পরিবর্তে লোকে মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করিত। এই পূজা আট দিনে সম্পন্ন হইত।

প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। বর্তমানে তাহার এক আনা মাত্র আছে কিনা সন্দেহ। শরৎঋতু যমদংষ্ট্রা, লক্ষ্মীও চঞ্চলা। মেলেরিয়ায় ও কালদোষে যাবতীয় উৎসব শ্রীহীন ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রায় কত ব্রত, কত পূজা, কত পরব ছিল তাহা পাঁজি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকটিতেই অস্ফুট আশঙ্কা ও বিমল তৃপ্তি মিলিত হইয়া জীবন মধুময় ও উপভোগ্য হইত।

পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে অনেক বাড়ীতে দশভুজার পূজা হইয়া থাকে।

সে দেশ নিশ্চয় ধন্য। দুঃখের বিষয় আমি সে দেশের দুর্গাপূজা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। পশ্চিমবঙ্গের আর সে দিন নাই। এখন গ্রাম উৎসবহীন নিরানন্দ। সে উৎসাহ সে ভক্তি সে আনন্দ সে 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ধ্বনি আর নাই। "গিরি হে, গৌরী আমার এসেছিল," এই হৃদয়স্পর্শী গানও নাই। এখন যাঁহারা পূজা করিতেছেন, তাঁহারা পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত ব্রত পালন করিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন।

কয়েক বৎসর হইতে নগরে নগরে সর্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছে। সে কালে আমরা যাহা বারোয়ারী বলিতাম এখন তাহা সর্বজনীন নাম পাইয়াছে। কারণ বার শব্দ সংস্কৃত। ইহার অর্থ 'সমূহ'। সমূহ মিলিয়া যে পূজা, তাহা বার-আরী, বারোয়ারী পূজা। বারোয়ারী কালীপূজা প্রচলিত ছিল। গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া কালীপূজা করিত। বিশেষতঃ মহামারী হইলে গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া রক্ষাকালীর পূজা করিত। সর্বজনীন হউক, বারোয়ারী হউক, কবি বলিয়াছেন, "শক্তিপূজা মুখের কথা নয়।"

এখনকার ইংরেজী-পড়া যুবকেরা দেবদেবীর পূজার অর্থ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করে কুসংস্কার। অনেকে পূজা শব্দের অর্থও জানে না। মনে করে পুষ্প নৈবেদ্য না দিলে পূজা হয় না। তাহারা ভাবে না, মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশে আসিলে সহস্র সহস্র নরনারী তাহাঁর পূজা করিয়াছিল। আচরণ দ্বারা, কেহ তাহাঁর প্রিয় চরকায় সূতা কাটিয়া, কেহ তাহাঁর কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পূজা করিয়াছিল। লাটসাহেব নগরে আসিবার পূর্বে পথ পরিষ্কৃত ও জল-সিক্ত, পথের দুই পার্শ্বে বনমালা লম্বিত, স্থানে স্থানে তোরণ নির্মিত, সভামণ্ডপ সুসজ্জিত হয়। আগমন কালে তূর্যধ্বনি হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাহাঁর স্তব করেন, তাহাঁর গুণ ও কর্ম কীর্তন করেন। ইংরেজীতে বলি address পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা করেন। যেমন, আমাদের জলকষ্ট হইয়াছে জল দান করুন, আমরা মেলেরিয়া রোগে ভুগিতেছি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, আমাদের

যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিউন ইত্যাদি। আমরা গুরুজনের পূজা করি, বন্ধুর পূজা করি। আচরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের সহৃদয়তা কামনা করি। যাহা হইতে উপকার আশা করি, তাহা আমাদের পূজার্হ। আমরা গাভীর পূজা করি। গাভীর দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, তাহা স্মরণ করি। গৃহের অঙ্গণে তুলসী গাছ পালন করি, দেখিলে হরি স্মরণ হয়। ইহার মধ্যে কু কোথায়? বর্ষে বর্ষে এক নির্দিষ্ট দিনে রবীন্দ্রনাথের পূজা হইতেছে। তাঁহার চিত্র পুষ্পমাল্য বেষ্টিত হইয়া উচ্চ মঞ্চে স্থাপিত হইতেছে। ভক্তেরা তাহাঁর স্তব করেন। কেহ কি চিত্রের পূজা করেন? তবে চিত্র কেন? পুষ্পমাল্য কেন? দিন নির্দিষ্ট কেন?

দুর্গাপূজা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কল্পান্তর ও আনুষঙ্গিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখিলে মনে হয়, এই পূজা একদেশে প্রবর্তিত ও বর্ধিত হয় নাই। নানা দেশের প্রচলিত বিধি ও আচার যুক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা এইসকল আগন্তুক অনুষ্ঠান দেখিয়া উৎপত্তি চিন্তা করিয়াছেন। কেবল শাখা-পল্লব দেখিলে এইরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। আমি ছয়টি প্রকরণে মূল ও মূল হইতে শাখা অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি।

২

শ্রীশ্রীদুর্গা

অনেক পুরাণে দুর্গার স্তবে, দুর্গা কে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যে শক্তি বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, পরমাণু হইতে বিশাল ব্রহ্মান্ড—যাহার আদি নাই, যাহার অন্ত নাই, যাহার মধ্য নাই, যাহা চিন্তার অতীত, যেখানে দিক নাই, কাল নাই, তাহা যে শক্তির প্রকাশ, সে শক্তিই দুর্গা। শক্তি ব্যতিরেকে কর্ম হয় না। এই যে বিশ্ব সৃষ্টি, তৃণ জন্মিতেছে, বাতাস বহিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, রাত্রে চন্দ্র উঠিতেছে, তারা দীপ্তি পাইতেছে, শক্তি ব্যতীত সম্ভবিতে পারে না। তিনি আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্নেহ, দয়া, বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞা রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। কত কাল হইতে এই ভাবনা আমাদের পূর্ব-পিতামহ আর্যগণের চিত্তে উদিত হইয়াছিল?

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ১২৫-এর সূক্ত দেবী-সূক্ত নামে খ্যাত (সূক্ত, স্তোত্র)। ইহাতে আটটি ঋক্‌ (মন্ত্র) আছে। রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিতেছি।

১। আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই সহায়তাতে সেইসকল কার্য করেন।

৭। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি, সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

৮। আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে।

রুদ্র, বসু, আদিত্য, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা প্রকৃতির এক এক শক্তির নাম। তিনিই তাবৎ শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হইতেছেন। তিনি সলিলময় আকাশ-সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ইত্যাদি। তিনিই দুর্গা নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই সূক্তের বক্তা কে? নিশ্চয় তিনি দুর্গা। ঋগ্‌বেদে এই সূক্তের দেবতাকে বাক্ বলা হইয়াছে। অবশ্য কোন ঋষি প্রজ্ঞা-রূপা বাক্‌দেবীর দ্বারা আবিষ্ট হইয়া এই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

দুর্গা ভাবনার মূল পাইলাম। কতকাল পূর্বে এই মূলের উৎপত্তি? ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অন্যান্য সূক্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক কৃষ্টির অন্তিম কালে এই সূক্ত অনুভূত হইয়াছিল। সে কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দ। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দ যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের কাল। ঋগ্‌বেদ হইতে এই তিন বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। এইসব কাল-নির্ণয়ে পশ্চিমমুখী পাঠকেরা বিস্মিত হইতে পারেন। যখন তাহাঁরা মহিষাসুরবধ বৃত্তান্ত শুনিবেন, তখন আরও বিস্মিত হইবেন।

এই সূক্তই যে দেবীপূজার মূল, তাহার প্রমাণ দিতেছি। (১) মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে আছে, রাজা সুরথ চণ্ডীপূজার সময় দেবীসূক্ত জপ করিতেন। তদ্‌দ্বারা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীমাহাত্ম্য দেবীসূক্তের বিস্তার। বেদ পাঠে ও শ্রবণে যাহাদের অধিকার ছিল না, তাহাদের শ্রবণনিমিত্ত পুরাণকার দেবীসূক্তের অনু-বাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতীতির নিমিত্ত অসুরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ ও অসুরপরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্র দেবগণের রাজা। দেবগণকে লইয়া ইন্দ্র মহিষাসুরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে তেজঃ নির্গত হইল। সকল তেজঃ মিলিত হইয়া জ্বলনশীল পর্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে সেই তেজোরাশি এক নারীরূপে আবির্ভূত হইল। তিনিই মহিষাসুর বধ করেন। এইজন্য তাহাঁর নাম মহিষমর্দিনী। তিনি সকল দেবের

সম্মিলিত শক্তি, বিশ্বশক্তি। এই কারণে দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠ অবশ্য-কর্তব্য হইয়াছে। (৩) পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও তামিল দেশে দুর্গাপূজা হয় না, সে সময়ে সরস্বতী পূজা হয়। আমরা বঙ্গদেশে যেমন শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা করি, সে সে দেশের বিদ্যার্থীরা আশ্বিন শুক্ল সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে সরস্বতীর পূজা করে। অতএব দেবী-সূক্তের বাক্ দুর্গারই নামান্তর।

কার এই শক্তি?

কেন-উপনিষদ নামে একখানি উপনিষদ আছে। তাহার প্রথমে 'কেন' শব্দ আছে। এই হেতু সে উপনিষদের নাম কেন-উপনিষদ। এই উপনিষদে উক্ত প্রশ্নের বিস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে।

কে মনকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়, কে প্রাণকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়? কাহার ইচ্ছাতে লোকে এইসকল বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ দেবই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন? তিনি (ব্রহ্ম) চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন।

একদা দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ জয়ী হইলেন। তাহাঁরা মনে করিলেন, এই বিজয় তাহাঁদেরই। তিনি জানিতে পারিলেন, তাহাঁদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু এই মহদ্ভূত কে, ইহা তাহাঁরা জানিতে পারিলেন না।

তাহাঁরা অগ্নিকে বলিলেন, "হে সর্বজ্ঞ, এই মহদ্ভূত কে, তুমি জানিয়া আইস।" অগ্নি তাহাঁর নিকটে গমন করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,

"তুমি কে? তোমাতে কি শক্তি আছে?"

"আমি অগ্নি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি।"

"ইহা দগ্ধ কর," এই বলিয়া ব্রহ্ম তাহাঁকে একটি তৃণ দিলেন।

অগ্নি সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন।

"তুমি কে?"

"আমি বায়ু, মাতরিশ্বা (আমি আকাশে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস করি। অর্থাৎ আমি বহমান বায়ু।)"

"তোমার কি শক্তি আছে?"

"পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পারি।"

"এই তৃণটি গ্রহণ কর।"

বায়ু সমুদয় বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র গিয়া দেখিলেন সেই আকাশে স্ত্রীরূপিণী অতিসৌন্দর্যশালিনী হৈমবতী উমা আবির্ভূতা। ইন্দ্র তাহাঁর নিকটবর্তী হইয়া তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ইনি কে?"

"ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।"

ইন্দ্রাদি দেবতা যাহাঁকে জানিতে পারিলেন না, তাহাঁকে কিরূপে উমা জানিলেন? উমা কে? তিনি হিমালয়ের কন্যাই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মস্বরূপিণী, নচেৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেন না। তিনি ব্রহ্মের শক্তি। সে শক্তি আদ্যাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি ইন্দ্রকে ব্রহ্ম দেখাইয়াছিলেন। অতএব আদ্যাশক্তির উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। তন্ত্রশাস্ত্রেও এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। প্রকৃতি-ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার আর কি উপায় আছে?

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্মদ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ, ইহা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কল্পনা দ্বারা অগ্নি ও ইহার দাহিকাশক্তি পৃথক্ ভাবিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক করিতে পারি না।

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ অগ্নিকে যাবতীয় শক্তির প্রতিনিধি করিয়াছিলেন। অগ্নির এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম জাতবেদা, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে, তিনি সব জানেন। বিশ্ববিৎ, তাহাঁর

আর এক বৈদিক নাম। তিনি বিশ্ববেত্তা। তিনি কেমন করিয়া জানেন? কারণ তিনি সকল পদার্থেই আছেন। ঋগ্‌বেদে ঋষিগণ বৃষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি এই যজ্ঞে উপস্থিত হও, আর আমাদের প্রদত্ত হব্য-কব্য গ্রহণ কর। এই সোমরস পান কর।" এই বলিয়া তাহাঁরা অগ্নিতে সে সে দ্রব্য অর্পণ করিতেন। কারণ ইন্দ্র এক শক্তি, অগ্নি ইন্দ্রশক্তির প্রতিনিধি। অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে অগ্নিতে যাহা অর্পিত হয় তাহা ইন্দ্র পাইয়া থাকেন।

ঋগ্‌বেদ হইতে (রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ) অগ্নির গুণ ও যৎ-কিঞ্চিৎ পরিচয় তুলিতেছি।

অগ্নি সমস্ত ভুবন পর্যবেক্ষণ করেন (১০।১৮৭।৪)। হে অগ্নি! কর্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। স্তুতি সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয় (৪।১১।৩)। হে অগ্নি! তুমি শক্তি-পুত্র, যুবা, যবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা) জ্ঞানসম্পন্ন (৬।৫।১)। হে জাতবেদা! তুমি মহত্ত্ব দ্বারা দেবগণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ (৭।১৩।২)। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছি (৮।৪৩।২১)। অগ্নির মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও অধিক (১।৫৯।৫)। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। তুমি বরুণ, তুমি শত্রুবিনাশক মিত্র, তুমি আকাশের অসুর রুদ্র, (২।১।৩...৭)। তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ। হে অগ্নি! তোমাতে সমস্ত দেবগণ অবস্থিতি করেন (৫।৩।১)। তুমি অমিত তেজোবলে অপরিমিত অয়ো-নির্মিত নগরীর দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, সত্যকারী সনাতন সর্বজ্ঞ। হে শক্তি-পুত্র! তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর, আমাদের রিপুগণকে জয় কর (৬।৪।৪)। অগ্নি ভ্রাতা (৮।৪৩।১৬)। তিনি পিতৃমাতৃস্থানীয় (৬।১।৫)। তিনি স্বস্তি দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন (৭।১১।৫)। ইত্যাদি।

এইরূপ অগ্নি-স্তুতি অনেক আছে। অগ্নি শক্তি-পুত্র বা বলের

পুত্র। মূলে আছে, 'সহসো সূনুং।' 'সহসো বলস্য সূনুং পুত্রম্'। সায়ন বুঝিয়াছেন, যেহেতু মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, সেই হেতু এই নাম (৬।৫।১)। এই ব্যাখ্যা ঠিক মনে হয় না। কারণ বালকেও অরণির দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। "শক্তির পুত্র", ইহার অর্থ শক্তিমান্। যেমন, মিত্র বরুণকে মহান্ বলের পৌত্র ও বেগের পুত্র বলা হইয়াছে (৮।২৫।৫)। এইসকল সূক্তে অগ্নির যে যে গুণ ও কর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম সংক্ষেপে দেবী-সূক্তেও হইয়াছে, পুরাণোক্ত দুর্গার স্তোত্রে সবিস্তরে হইয়াছে। অতএব দুর্গাতে যে শক্তি, অগ্নিতেও সেই শক্তি অনুভূত হইয়াছিল। অগ্নি তেজোময়। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অনুভব করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে পার্থিব অগ্নিরও বর্ণনা আছে। কাষ্ঠাগ্নি, বাড়বাগ্নি, পাষাণাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি, সূর্যাগ্নি, সকল অগ্নিরই দাহিকা শক্তি আছে। সকল অগ্নি মূলতঃ এক। কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নির পৃথক ভাবনা হইয়াছিল।

নারায়ণ উপনিষদ্ নামে এক উপনিষদ্ আছে। তাহাতে আছে,

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম ফলেষু জুষ্টাম্
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

যিনি অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপ দ্বারা জ্বলন্তী, যিনি স্বপ্রকাশা, যিনি কর্মফলের নিমিত্ত উপাসিতা, সে দুর্গাদেবীর শরণ লইতেছি। সেই সংসার তরণের হেতু তারিণীকে নমস্কার।

বেদের ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকে বিশ্বশক্তির প্রতিনিধি ভাবিয়াছিলেন এবং সেই হেতু অগ্নিকে ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ ইত্যাদি দেব বলিয়াছিলেন। কারণ এক এক দেব বিশ্বশক্তির অংশাংশ মাত্র। নারায়ণ উপনিষদ্ সে শক্তিকে দুর্গা বলিয়াছেন। (এই উপনিষদ্ তত পুরাতন বোধ হয় না। পুরাতন না-ই হউক, বেদোক্ত বর্ণনা হইতে এই মন্ত্রের ভাব গৃহীত হইয়াছে)।

যদি দুর্গার পূজা করিতে হয়, কোন্ দেবের যজ্ঞাগ্নির পূজা করিব? ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেব কেহই ঈশ্বর নাম পান নাই। কেবল রুদ্র, মহেশ্বর, মহাদেব এই এই নাম পাইয়াছিলেন। অতএব রুদ্র যজ্ঞাগ্নিকে দুর্গা রূপে পূজা করিতে পারি। ঋগ্‌বেদে রুদ্র, মহেশ্বর রূপে পূজিত না হইলেও তিনি শিব (মঙ্গলময়) বিবেচিত হইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, রামেশ্বর ইত্যাদি মহাদেবের নামে ঈশ্বর আছে, আর কোন দেবের নামে নাই। মহেশ্বরের যজ্ঞাগ্নি, মহেশ্বরের শক্তি বা মহেশ্বরী। এই অগ্নি রুদ্রের রুদ্রাণী। ইন্দ্রাগ্নি ইন্দ্রশক্তি, ইন্দ্রাণী। বরুণাগ্নি বরুণ-শক্তি বরুণানী, বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী। মহেশ্বর ও মহেশ্বরী, রুদ্র ও রুদ্রাণী ইত্যাদি নাম হইতে দুই পৃথক্ মনে হইতে পারে, কিন্তু পৃথক্ ভাব কাল্পনিক, বাস্তবিক নয়। অতএব রুদ্রের যে গুণ ও কর্ম রুদ্রাণীরও তাহাই। দেব ও তাঁহার অগ্নিকে পতি-পত্নী কিম্বা ভ্রাতা-ভগিনী, দুইই কল্পনা করা যাইতে পারে। এক উদ্দেশ্যে দেবের স্তুতি ও অগ্নির সাহায্য আবশ্যক হয়। এই হেতু রুদ্রাগ্নিকে রুদ্রের ভগিনী বলিতে পারা যায়। যজুর্বেদে ইহাই আছে।

কোন্ ঋতুতে রুদ্র-যজ্ঞ হইত, ঋগ্‌বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কোন দেবতারই নাই। কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় শরৎঋতুর আরম্ভে রুদ্র-যজ্ঞ হইত। ইহার বিশেষ প্রমাণ যজুর্বেদে আছে। সেখানে রুদ্রাণী অম্বিকা নামে উক্ত হইয়াছেন। এক স্থানে শরৎ ঋতু অম্বিকা-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যজুর্বেদের কাল নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত "বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়" প্রবন্ধাবলীর "যজুর্বেদের কাল" পড়িতে পারেন। সেকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দ। অথর্ব বেদেরও সেই কাল।

শরৎঋতু কোন্‌টি? আমরা গণি, আশ্বিন কার্ত্তিক দুই-মাস শরৎ। কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎঋতু চিরকাল ছিল না। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গণনা হইয়াছিল। যে মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাস আশ্বিন মাস, যে মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাস কার্ত্তিক। চন্দ্র ও নক্ষত্র যুক্ত করিয়া

আশ্বিনাদি মাসের নাম হইয়াছে। কিন্তু সূর্য ঋতু বিধান করেন, চন্দ্র করেন না। কোন নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া সে নক্ষত্রে পুনরাগত হইলে সূর্যের এক বৎসর হয়। বৎসরে দুই অয়ন, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে তিন ঋতু, শিশির (শীত), বসন্ত, গ্রীষ্ম। দক্ষিণায়নে তিন ঋতু, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। দুই মাসে এক ঋতু। অতএব বর্ষাঋতু গতে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইতে দুই মাস গতে শরৎঋতুর প্রথম মাস। বেদের কালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে বৎসর ধরা হইত। আমাদের কোন কোন ধর্ম-কৃত্যে সে বৎসর ধরিতে হয়। ঋগ্‌বেদের আদ্যকালে এই গণনা ছিল। হিমঃ (শীত) ঋতু হইতে আরম্ভ বলিয়া ঋষিগণ বৎসরকে 'হিমঃ' বলিতেন। তাহাঁরা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন আমরা শতহিমঃ জীবিত থাকি। পরে, বোধ হয় কাল রুদ্রযজ্ঞ হেতু শরৎঋতু হইতে আর এক বৎসর আরম্ভ করিতেন। সে বৎসরের নাম শরৎ ছিল। ঋষিগণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমরা যেন শত শরৎ জীবিত থাকি। সংস্কৃত ভাষায় শরৎ শব্দের এক অর্থ বৎসর হইয়া গিয়াছে। যথা, অমরকোষে, সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমাঃ। অতএব শারদীয় উৎসব কেবল দুর্গোৎসব নহে, নববর্ষ প্রবেশের উৎসবও বটে। এই কারণে দুর্গোৎসবের মাহাত্ম্য বাড়িয়া গিয়াছে।

কোন নক্ষত্র হইতে সে নক্ষত্রে সূর্যের পুনরাগমন কাল এক বৎসর; অতএব ইহা নাক্ষত্রিক বৎসর। পূর্বকালে ৩৬৬ দিনে এক নাক্ষত্রিক বৎসর ধরা হইত। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, কিম্বা পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক চান্দ্র মাস। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে ৩৬০ তিথি, কিন্তু ৩৫৪ দিন। অতএব দ্বাদশ চন্দ্র দ্বারা বৎসর পূর্ণ করিতে হইলে আরও (৩৬৬—৩৫৪) ১২ দিন আবশ্যক হয়। ১২ দিন ১২ তিথি। মাসে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া বার মাসে বার তিথি। বৈদিক পাঁজিতে এই গণনা ছিল।

কবে শরৎঋতুর আরম্ভ, এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। হিম-বৎসরের আট চান্দ্র মাস গতে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎঋতুর আরম্ভ। এই কারণে দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য হইয়াছে।

কোন্ দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ? দিক্‌চক্রে সূর্যোদয় কিম্বা সূর্যাস্ত

স্থান দেখিয়া স্থূলভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু যজ্ঞাদি ধর্মকৃত্যের আয়োজন আছে, পূর্বে না জানিলে যথাদিবসে সে কর্ম নির্বাহ হইতে পারে না। যে নক্ষত্রে রবি আসিলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, এই কারণে সে নক্ষত্র জানা আবশ্যক হইয়াছিল। দৈবক্রমে চিরদিন একই নক্ষত্রে উত্তরায়ণাদি (উত্তরায়ণ আরম্ভ) হয় না। ৯৬০ বৎসর পূর্বে যে নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, এখন সে নক্ষত্রে হয় না, পশ্চিম দিকের নক্ষত্রে হইতেছে। অর্থাৎ উত্তরায়ণাদি পিছাইয়া আসিতেছে। নক্ষত্র স্থির; অয়নাদি শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিমগামী হইতেছে। বর্ষচক্র বিষ্ণু-চক্র। দুই অয়নাদি ও দুই বিষুব, এই চারি স্থান চারি বিষ্ণুপদ। একটির যে পরিমাণ পশ্চাৎ গমন হয়, অপর তিনটিরও সেই পরিমাণ হয়। নক্ষত্র স্থির আছে, সুতরাং মাস ও বর্ষচক্রের যথাস্থানে আছে। ঋতু পিছাইতেছে। শতাধিক দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছায়। আমরা সবাই জানি অধুনা ৭ই আশ্বিন শারদ বিষুব হয়। ষোল শত বৎসর পূর্বে ৩০শে আশ্বিন হইত। বস্তুতঃ সৌরমাস গণনায় এখন ৭ই ভাদ্রে শরৎঋতুর আরম্ভ হইতেছে। বিষ্ণু পদের পশ্চাৎ গতি আছে বলিয়াই বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে।

পরে দেখা যাইবে কালপুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা। কালপুরুষ নাম বৈদিক নহে, বৈদিক নাম মৃগ নক্ষত্র। কত শত বৎসর পূর্বে শরৎ-ঋতুর আরম্ভে সন্ধ্যার পর এই নক্ষত্রের উদয় হইত? এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়। আমরা অগ্রহায়ণ মাস জানি। ভারতের তাবৎ স্থানে এই মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। যে মাসে মৃগ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪ সূক্তে সোম ও রুদ্র একসঙ্গে আহূত হইয়াছেন। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, "তোমাদের যজ্ঞ ব্যাপ্ত হউক।" এখানে সোম অর্থে চন্দ্র, সম্ভবতঃ পূর্ণচন্দ্র, অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে রুদ্রযজ্ঞ হইত। যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে) পূর্বলিখিত নির্বচন অনুসারে কার্ত্তিক মাস শরৎঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহার ২০০০ বৎসর অর্থাৎ খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ হইতে অগ্রহায়ণ মাস শরৎ বৎসরের প্রথম মাস হইয়াছিল। এই কথাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "মাসানাং

মার্গশীর্ষোঽহম্‌”, আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ নামের অর্থও তাই। হায়ন বৎসর, বৎসরের অগ্র, প্রথম মাস। পরে দেখা যাইবে, যজুর্বেদের কালে ও তাহারও পূর্বে শরৎঋতুর আরম্ভে মধ্য রাত্রে দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল।

দুর্গা কে? ইহার ত্রিবিধ উত্তর পাইয়াছি। আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। ইহা আধিভৌতিক অর্থ। দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। ইহা আধিদৈবিক অর্থ। রুদ্রদেবের শক্তি, রুদ্র-যজ্ঞীয়াগ্নি। সে অগ্নি নানা রূপে খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

৩

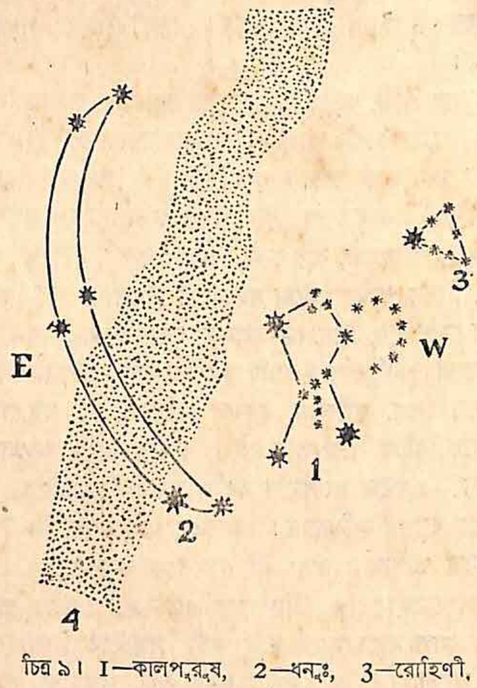
মহিষমর্দিনী

দুর্গাদেবী মহিষমর্দিনী-রূপে ভাবিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এক অসুরের আকার মহিষের তুল্য ছিল, অথবা সে অসুর মহিষের আকার ধরিতে পারিত। দেবী তাহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবী রুদ্রের শক্তি, রুদ্রাণী। দেবের যে রূপ, যে গুণ, যে কর্ম, যে আয়ুধ, যে বাহন, দেবীরও তাহাই। রুদ্র ভয়ংকর দেবতা। রুদ্র নামেই প্রকাশ, তিনি মানুষকে রোদন করাইতেন। [রোদয়তি (মনুষ্যান্)—ভানুজি দীক্ষিত]। ঋগ্‌বেদের আর্যগণ এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ও আর্ত হইয়া মনে করিতেন, রুদ্র সেই রোগের কর্তা, তাঁহার নিকট রোগের ভেষজ আছে, তিনি প্রসন্ন হইলে মহামারী উপশান্ত হইবে। ঋগ্‌বেদের অন্তিম কালে সেই রুদ্র, শিব. (মঙ্গলময়) হইয়াছিলেন। যজুর্বেদে তিনি মহেশ্বর, মহাদেব, শর্ব, ভব ইত্যাদি অনেক নাম পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া রুদ্রদেব শিব. হইলেন, কেমন করিয়াই বা মরুৎগণের পিতা হইলেন, ইত্যাদি বিচিত্র পরিবর্তন হইল, তাহার সম্যক্ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। এখানে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

মৃগ নক্ষত্রে রুদ্রের অধিষ্ঠান। অতএব মৃগ নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা এই নক্ষত্রকে কালপুরুষ বলি। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভোর ৪টার সময় এই নক্ষত্র উঠিতে দেখা যাইবে। তদনন্তর উদয়-কাল মাসে মাসে দুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১২টার সময় এবং অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৮টার সময় এই নক্ষত্রের উদয় দেখা যাইবে। কালপুরুষের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে আছে। জ্যোতিষে নাম মৃগশিরা বা মৃগশীর্ষ। দুই বাহুতে দুইটি, দুই পদে দুইটি বড় বড় তারা আছে। দক্ষিণ বাহুর তারা উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, জ্যোতিষে ইহার নাম আর্দ্রা। কটিতে তিনটি তারকা এক তির্যক্ রেখায় আছে, নাম

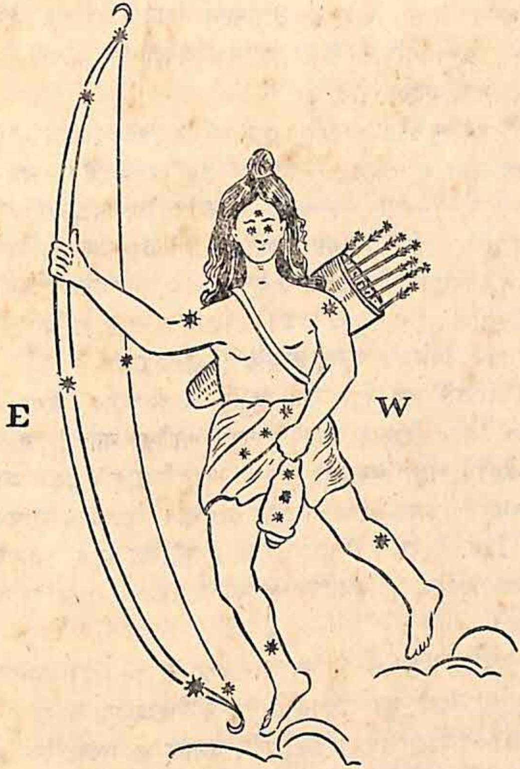
ইল্বকা। ইহাদের নিকটে আর দুইটি তারা আছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট। কটির দক্ষিণে ও মধ্যস্থলে তিনটি তারা আছে, মধ্যেরটি এক নীহারিকা, ক্ষুদ্র শ্বেত মেঘখণ্ডের মত দেখায়। এই তিন তারাকে কালপুরুষের বস্ত্রাঞ্চল বলা যাইতে পারে। (এই তিন তারায় রুদ্রের জ্যোতির্লিঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল)। এই তেরটি তারা আধার করিয়া



চিত্র ৯। 1—কালপুরুষ, 2—ধনুঃ, 3—রোহিণী, 4—স্বর্গঙ্গা

রুদ্রের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। কালপুরুষের পূর্ব দিকে বক্রাকারে ছয়টি তারায় হরধনুঃ, জ্যোতিষে নাম পুনর্বসু। এই ছয় তারার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের তারাটি অতিশয় উজ্জ্বল। আকাশে ইহার তুল্য উজ্জ্বল তারা আর একটিও নাই। জ্যোতিষে ইহার নাম ব্যাধ বা মৃগব্যাধ।

সেখানে ছায়াপথ অর্থাৎ সুরগঙ্গা তির্যক্ ভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে। কালপুরুষের পশ্চিম দিকে কতকগুলি ছোট ছোট তারা ধনুর আকারে দেখা যাইবে। চিত্র দেখিলে এইসব তারা চিনিতে কিছু-



চিত্র ১০। পিণাক-পাণি রুদ্র

মাত্র কষ্ট হইবে না (চিত্র ৯)। দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্র দেখিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব দিক, দক্ষিণ পার্শ্ব পশ্চিম দিক।

কালপুরুষের ত্রয়োদশ তারা লইয়া মৃগ নক্ষত্র। মস্তকের তিনটি তারা মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা। চারি পদে চারিটি, পুচ্ছে তিনটি, উদরে তিন তারায় একটি বাণ, ব্যাধ নিক্ষেপ করিয়াছে। পুরাণে মৃগ নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া দশ-বারটি উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। রুদ্রের একটি দুইটি বিশেষণ কিম্বা উপমা এইসব উপাখ্যান রচনার আশ্রয় হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রুদ্রদেবের প্রতিকৃতি লিখিত হইল (চিত্র ১০)।

ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৩৩-এর সূক্তের দেবতা রুদ্র। এই সূক্তে রুদ্রের রূপ ও তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা আছে। যথা—(রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ),—রুদ্র বজ্র-বাহু, কোমলোদর, বভ্রুবর্ণ, সুনাসিক, দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, হিরণ্ময় অলঙ্কার-শোভিত, আরণ্য পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, ধনুর্বাণধারী, অতিশয় প্রবৃদ্ধ, যুবা, নিষ্কধারণকারী, সমস্ত ভুবনের অধিপতি ('ঈশান') ও ভর্তা। তিনি নানা রূপ-বিশিষ্ট ('বিশ্ব-রূপ')। তিনি রথস্থিত যুবা, তাহাঁর সেনা আছে।

রুদ্রের নিকট বর প্রার্থনা।—তুমি ভিষকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর। সর্ব শরীর ব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। পাপ বিদূরিত কর। শত্রু বিনাশ কর। আমাদিগকে তোমার জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত করিও না। তোমার সুখকর ওষধি দ্বারা শত হিম. (বর্ষ) ('শতং হিমাঃ') জীবিত রাখ, তোমার মহতী দুর্মতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর।

প্রথম মণ্ডলের ১১৪-এর সূক্তে রুদ্রের রূপ।—রুদ্র কপর্দী, বীর-নাশী, স্বর্গীয় বরাহ, মরুৎগণের পিতা, দীপ্তিমান্।

প্রার্থনা।—আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান্ ও যজ্ঞসাধক ও কুটিল-গতি ও মেধাবী রুদ্রকে আহ্বান করি। যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ কুশলে থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও না। গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না, আমাদের পিতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদের প্রিয় শরীরকে

বধ করিও না। আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না। আমাদিগের অন্য মনুষ্যকে হিংসা করিও না। গো ও অশ্ব হিংসা করিও না, বীরদিগকে হিংসা করিও না, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি।

ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪-এর সূক্তের দেবতা সোম ও রুদ্র।—"হে সোম ও রুদ্র! যজ্ঞ সকল প্রতি গৃহে তোমাদিগকে পর্যাপ্ত রূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ বিয়োজিত কর। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ন শর আছে। তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য ভেষজ ধারণ কর। আমাদিগের শরীর পাপ হইতে মুক্ত কর।"

উপরি-উক্ত তিন সূক্ত হইতে রুদ্রের রূপ ও গুণের পরিচয় পাইতেছি। তিনি কদর্পী অর্থাৎ তাহাঁর মস্তকে জটা আছে। তাহাঁর নাসিকা সুন্দর, উদর কোমল (লম্বোদর)। তিনি সপ্ত রত্ন ধারণ করিতেছেন, দুই বাহুতে দুই, দুই পদে দুই, বক্ষে তিন, এই সাত রত্ন। বক্ষের তিনটি রত্ন তিন নিষ্ক (সুবর্ণমুদ্রা) কণ্ঠ হইতে মাল্যাকারে শোভিত হইয়াছে। তিনি ধনুর্বাণধারী। কালপুরুষের পূর্ব দিকের ছয়টি তারায় ধনুঃ, পশ্চিম দিকের কয়েকটি তারা তাহাঁর বাণ। তাহাঁর 'হেতি' (অস্ত্র) আছে। তাহাঁরা বাম হস্তে বজ্র। তিনি দীপ্তিমান্, কারণ তারকা-ময়। তিনি বভ্রু অর্থাৎ অরুণবর্ণ, আর্দ্রা তারার এই বর্ণ। জ্যোতিষে রুদ্র আর্দ্রা তারার অধিপতি। মস্তকের উপরে সোম (চন্দ্র), জ্যোতিষে মৃগ নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র। ঋগ্‌বেদের এক স্থানে (৭।৫৯।১২) তাহাঁকে ত্র্যম্বক বলা হইয়াছে। ত্র্যম্বক শব্দের বহুবিধ অর্থ আছে; যথা—যাহাঁর তিন মাতা আছেন, যিনি ত্রিলোকের অম্ব—পিতা, ইত্যাদি। অনেকে ত্র্যম্বক অর্থে ত্রিনয়ন বুঝিয়াছেন। তিনি বহুরূপ-বিশিষ্ট যেহেতু উদয়কালে কালপুরুষের যে রূপ দেখা যায়, মধ্য আকাশে সে রূপ দেখা যায় না, অস্তকালে আর এক রূপ দেখা যায়। অপিচ, তিনি যুবা, যবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা), কারণ, প্রত্যহ তাহাঁর জন্ম হয়; আবার

প্রবৃদ্ধ অপেক্ষাও প্রবৃদ্ধ [বুড়া শিব]। তিনি উগ্র, তিনি দিব্য অসুর, দিব্য বরাহ। তিনি আরণ্য বরাহ, মহিষ ও সিংহের তুল্য ভয়ংকর। তেরটি তারা লইয়া বহুবিধ আকার কল্পনা করা যাইতে পারে।

রুদ্র উগ্রদেব। তিনি মনুষ্য ও গবাদি গ্রাম্য পশুর হিংসা করেন। তিনি প্রসন্ন হইলে আমাদিগকে ব্যাধিমুক্ত করিতে পারেন। তিনি ভিষগ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [ইনিই আয়ুর্বেদের ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি ধনুর্ধারী। পুরাণে ইনিই ক্ষীরোদ-সাগর-মন্থনে হস্তে অমৃত-ভান্ড লইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। চন্দ্র সুধাময়, অমৃত-ভান্ড।]।

রুদ্র যজ্ঞ-সাধক ছিলেন। অর্থাৎ, তাহাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ হইত। কোন্ ঋতুতে যজ্ঞ হইত, তাহার উল্লেখ নাই। কোন দেবতারই যজ্ঞকাল লিখিত হয় নাই। প্রসঙ্গ, দেবতার গুণ ও কর্ম দেখিয়া যজ্ঞকাল বুঝিতে হয়। উপরের সূক্তে পাওয়া গিয়াছে, চন্দ্র রুদ্রের শিরঃ-স্থানীয়। এই চন্দ্র অমাবস্যার পূর্বরাত্রের কলাচন্দ্র অথবা পূর্ণচন্দ্র হইতে পারে। সূর্যোদয়ের পূর্বে হইলে কলাচন্দ্র, সূর্যাস্তের পরে হইলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইতে পারে। ১।৪৩ সূক্তে এক ঋষি বলিতেছেন, "যেন রুদ্র, মিত্র ও বরুণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন।" মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য, বরুণ বর্ষা ঋতুর আদিত্য। যেহেতু রুদ্রের সহিত মিত্র ও বরুণের নাম আসিয়াছে, সেহেতু রুদ্র দ্বারা বসন্তঋতু সূচিত হইতেছে, অন্য ঋতু হইতে পারে না। অর্যমা বসন্তঋতুর আদিত্য। অর্যমা স্থানে রুদ্র আসিয়াছেন। অতএব বুঝিতেছি, বসন্তকালে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে কলাচন্দ্র দর্শনের পরদিন যজ্ঞ হইত। এই হেতু এই তিথি অদ্যাপি শিবচতুর্দশী নামে খ্যাত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, শরৎ ও বসন্ত দুই যমদংষ্ট্রা। দেখা যাইতেছে, প্রথমে বসন্তকালে রুদ্রযজ্ঞ হইত; কিন্তু যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে কালপুরুষ দেখা যাইত না, সূর্যাস্তের পরে দেখা যাইত, তখন শরৎঋতুতে যজ্ঞ হইত। বর্তমান গণনায় দুই-মাসে বসন্তঋতু, মধ্যস্থলে মহাবিষুব। কতকাল পূর্বে কালপুরুষ নক্ষত্রে মহাবিষুব হইত, তাহা মোটামুটি গণিতে পারা যায়। আর্দ্রা তারার অধিপতি রুদ্র। বর্তমানে আর্দ্রা তারা মহাবিষুব বিন্দু হইতে পূর্ব-দিকে ৯০° অংশ দূরে আছে। ১° অংশ অতিক্রম করিতে ৭৩ বৎসর ধরা

যাইতে পারে। অতএব ৯০×৭৩=৬,৫৭০ বৎসর পূর্বে আর্দ্রাতে মহাবিষুব হইত। বর্তমান খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫০ বিয়োগ করিলে ইহা খ্রী-পূ (৬,৫৭০-১,৯৫০=) ৪,৬২০ অব্দের ঘটনা।

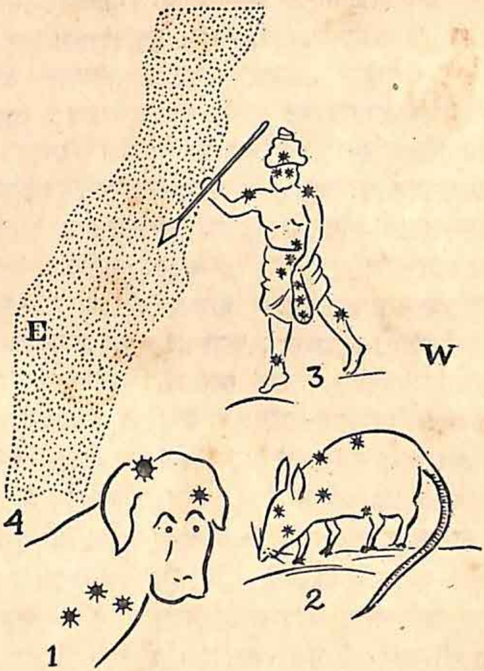
বসন্তঋতু গত হইল, গ্রীষ্ম আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ভোর রাত্রে কালপুরুষের উদয়ও হইত না। তাহাকে পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের সময় দেখা যাইত। গ্রীষ্মকাল বজ্র-বিদ্যুৎ ও ঝড়-বৃষ্টির কাল। তখন মরুৎগণ নামে এক গণ-দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন। তাহাঁরা রুদ্রিয়, রুদ্রের পুত্র। ঋগ্‌বেদে মরুৎগণের যে রূপ আছে, তাহা অবিকল রুদ্রের রূপ। তাহাঁদের হস্তে রুদ্রীয় ভেষজ আছে। প্রভেদের মধ্যে, এক পৃষতী (চিত্রহরিণ) তাহাঁদের রথ টানে। কোন কোন সূক্তে পৃষতী মরুৎগণের মাতা এবং তাহাঁদের হস্তে বাশী (ছুতারের বাইশ) আছে। এই পৃষতী অতিশয় দ্রুতগামী, ঝড়ের দ্যোতক। ঝঞ্ঝাবাতের সহিত বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সে ঋতুতে ব্যাধিরও উপশম হইতেছিল। এই কারণে রুদ্র শিব. (মঙ্গলময়) হইলেন (১০।৯২।৯)।

উপরে দেখিয়াছি, শরৎঋতুতে কালপুরুষ নক্ষত্র সন্ধ্যা ৭ টার সময় উদিত হইত। শরৎঋতুও এক যমদংষ্ট্রা। সে সময়ে পূর্ণচন্দ্রও তাহার শিরঃ-স্থানে থাকিতে পারিত। মৃগশিরার অধিপতি চন্দ্র। ইহা হইতে আর এক কাল পাইতেছি। বর্তমানে মৃগশিরা নক্ষত্র মহাবিষুব বিন্দু হইতে প্রায় ৮৩° অংশ দূরে আছে। অতএব ইহা ৮৩×৭৩= ৬০৫৯ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ খ্রী-পূ (৬০৫৯-১৯৫০=) ৪১০৯ অব্দের কথা। যজুর্বেদ হইতেও বুঝিতেছি, শরৎঋতুর আরম্ভে আর্যগণ সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইতেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আছে, শরৎই রুদ্রের অম্বিকা, ভগিনী। রুদ্র তাহাঁরই দ্বারা হিংসা করেন।

কিন্তু ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ ঋতুর দোষ না দিয়া রুদ্রের ক্রোধ ও দুর্মতি কেন সন্দেহ করিয়াছিলেন? কারণ, তাহাঁরা দেখিয়াছিলেন, যে সময়ে রুদ্রের উদয় হয়, সে সময়ে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও ঘটে। রুদ্রের সহিত ব্যাধির নিত্য সম্বন্ধ হেতু তাহাঁরা রুদ্রকেই ব্যাধির কারণ অনুমান করিয়া ছিলেন। দুই এক মাস পরে রুদ্রের উদয় হইত না, ব্যাধিরও উপশম হইত। ফলজ্যোতিষের ভিত্তিও এই। পৃথিবীর যাহা কিছু

সব একই আছে, কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যহ একই নক্ষত্র রাত্রির একই সময়ে একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রই পার্থিব ব্যাপারের কারণ।

ঋগ্‌বেদে রুদ্রদেবের রূপ ও গুণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে, কিছু কিছু নূতনও



চিত্র ১১। 1—শ্বন্, 2—মূষিক, 3—কিরাতরূপী রুদ্র, 4—মূজবান্ পর্বত

আসিয়াছে। মৃগ নক্ষত্রের তারা সন্নিবেশ দেখিলে সহজে তাহা বিকটাকার মনে হইতে পারে। আর, বিকটাকার মনুষ্য দেখিলে যেমন তাহার বিকৃত গুণ অনুমান করি, সেই স্বাভাবিক ক্রমে রুদ্রেরও নিন্দনীয়

স্বভাব কল্পিত হইয়াছিল। অথর্ববেদে রুদ্র কিরাত-রূপ, তিনি এক বৃহৎ মুখবিবরবিশিষ্ট কুকুর লইয়া বেড়ান (চিত্র ১১)। শুক্ল যজুর্বেদ লিখিয়াছেন, এক 'আখু' (ইন্দুর) রুদ্রের প্রিয় পশু। রুদ্র ও তাহাঁর ভগিনীকে পুরোডাশ (যবচূর্ণের পিষ্টকবিশেষ) দেওয়া হইত। তাহাঁর প্রিয় পশুকেও ভাগ দেওয়া হইত। এই পাথেয় লইয়া রুদ্রকে মুজবান্ পর্বতের সে পারে স্বীয় আলয়ে যাইতে বলা হইত।*

ঋগ্বেদের কাল হইতে যজুর্বেদের কালের বহু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্বেদের আর্যগণ স্বর্গের ব্যাপার মর্তে আনিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে এক সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বভুবন সলিল-মগ্ন হইয়াছিল। যজুর্বেদের কালে তাহা পার্থিব জলপ্লাবন হইয়াছিল। বৈবস্বত মনু এক নৌকায় আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ স্থানে হিমালয়ে নৌকা বাঁধিয়াছিলেন। যজুর্বেদে তাহার নাম নৌবন্ধন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ ঋগ্বেদে দিব্য সরস্বতী বা স্বর্-নদী পুরাণে কভু ধবল পর্বত, কভু পুষ্পিত মুঞ্জ বা শরবন-রূপে কল্পিত হইয়াছিল। দিব্য সরস্বতী (ছায়াপথ) শ্বেত হিমালয়। তাহারই দক্ষিণ-পশ্চিম পারে কালপুরুষ নক্ষত্র। যিনি রুদ্র, তিনিই রুদ্রাণী, হিমালয়-দুহিতা হইয়াছেন। পুরাণে কার্ত্তিকেয় শরাচ্ছাদিত শ্বেত পর্বতে জন্মিয়াছিলেন। সে শরবন হিমালয়ের মুঞ্জবন, বাস্তবিক স্বর্ নদী।

কালপুরুষের মস্তকের তিনটি তারা ত্রিভুজাকারে অবস্থিত। বোধ

---

* বাঁকুড়া-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে হিমালয়ে মুঞ্জতৃণের অরণ্য দেখিয়াছিলেন। মুঞ্জ আমাদের পরিচিত শর গাছের তুল্য। মুঞ্জের ত্বক্ দ্বারা মুঞ্জরজ্জু নামক মসৃণ দীর্ঘকাল স্থায়ী রজ্জু নির্মিত হয়। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে মুঞ্জমেখলা পরিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দোড়িকে শর-মাঞ্জা বলে। তারপর আমার বন্ধু হিমালয়ের সে পারে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া বৃহদাকার ইন্দুর দেখিয়াছিলেন। এত বৃহৎ যে তিনি দূর হইতে শশক মনে করিয়াছিলেন। তারপর ক্রূর দস্যু ও তাহাদের ভীষণাকার হিংস্র কুকুরের সম্মুখে পাড়িয়াছিলেন। সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাহাতেই তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বর্ণনার সহিত যজুর্বেদোক্ত বর্ণনার আশ্চর্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যজুর্বেদের ঋষিগণ কৈলাস দর্শন করিয়াছিলেন।

হয় এই আকার দেখিয়া শুক্ল যজুর্বেদে (১৬।২৮) রুদ্রের মুখ কুক্কুরের তুল্য বলা হইয়াছে। ইহা হইতে মহাভারতের দুর্গাস্তবে দুর্গা কোকমুখা হইয়াছেন। কুক্কুরের মুখ হইতে শৃগালের মুখ আসিয়াছে, পরে পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্রই শিবা হইয়াছে। রুদ্রের নাসিকা সুন্দর, বোধ হয় দীর্ঘ। রুদ্র মৃগ (আরণ্য পশুর) তুল্য ভীম। রুদ্রের নাসিকা দীর্ঘ করিয়া বরাহ কল্পনা হইয়াছিল। রুদ্রের গণ আছে, তিনি গণপতি। পুরাণের গণপতি গজানন। তিনি রুদ্রের বিঘ্নবিনাশন মূর্তি। কালপুরুষ নক্ষত্রে গজমুণ্ড কল্পনা যেন বিদ্রূপ মনে হয়। হস্তী ত্রিবিধ—মৃগ, মন্দ, ভদ্র। এক প্রকার হস্তীর নাম মৃগ আছে। বোধ হয় মৃগ শব্দে হস্তী বুঝিয়া গজানন আসিয়াছে। আর্দ্রা তারা অরুণবর্ণ। গণেশ মূর্তিতে তাহা হিঙ্গুলবর্ণ হইয়াছে। রুদ্রের প্রিয় আখু, গণেশের বাহন মূষিক। গণেশ ত্রিলোচন। তাহাঁর পিতা মাতা নাই। বস্তুতঃ যে দেব বা দেবীর প্রতিমা ত্রিলোচন দেখা যায় তাহা রুদ্রপ্রতিমার রূপান্তর।

একদা দক্ষ প্রজাপতি হইয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সে যজ্ঞে যাবতীয় দেব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুদ্র হন নাই। দক্ষের সকল কন্যা যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুদ্রাণী হন নাই। পুরাণে রুদ্রাণী সতী নাম পাইয়াছেন। সতী পিত্রালয়ে গিয়া অপমানিতা হইয়া যজ্ঞাগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ক্রোধে রুদ্র বীরভদ্র উৎপাদন করিলেন। বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন এবং দক্ষের ছাগমুখ করিয়া দিলেন। এই বহু প্রচলিত উপাখ্যানে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, রুদ্র যজ্ঞভাগী ছিলেন না। বাস্তবিক আমরা ঋগ্বেদে দেখিয়াছি, রুদ্রযজ্ঞ বহু-প্রচলিত ছিল। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে উৎপাত-শান্তির নিমিত্ত রুদ্রহোম বিহিত ছিল। প্রজাপতি, যজ্ঞপতি, বর্ষপতি, অর্থাৎ প্রজাপতি কালের নাম। যে কাল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই কাল। কালপুরুষ নক্ষত্রই কালের প্রতিমা এবং দক্ষ। মৃগ নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব হইত। ক্রমে পশ্চাদ্গত হইয়া খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণীতে উপস্থিত হইল। দক্ষের প্রজাপতিত্ব বিনষ্ট হইল। ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ঋগ্‌বেদ বলিতে বস্তুতঃ ঋগ্‌বেদ সংহিতা বুঝিয়া আসিতেছি। সংহিতায় মন্ত্র আছে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা, প্রয়োগের বিচার ও আখ্যায়িকা আছে। এইরূপ অপর তিন বেদ-সংহিতারও ব্রাহ্মণ আছে। ঋগ্‌বেদ-সংহিতার এক ব্রাহ্মণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণে এক উপাখ্যান আছে (৩।১৩।৯)। যথা—পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ ধরিয়া রোহিণীরূপিণী কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। কিন্তু প্রজাপতিকে দণ্ড দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহাঁরা তাহাঁদের ঘোরতম শরীর একত্র মিলিত করিলেন। এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাহাঁর নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্‌কে বলিলেন, প্রজাপতিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। ভূতবান্ দেবগণের নিকট পশুগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাহাঁর নাম পশুমান্। তিনি বাণ দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি ঊর্ধ্বে উৎপতিত হইলেন। তাহাঁকে লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, আর যিনি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি মৃগব্যাধ। যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি রোহিণী। আর যাহা বাণ, তাহা ত্রিকাণ্ড (তিন অংশযুক্ত) বাণ হইয়াছে (চিত্র ১২)। এই উপাখ্যানের মূল ঋগ্‌বেদে আছে (১০।৬১)।

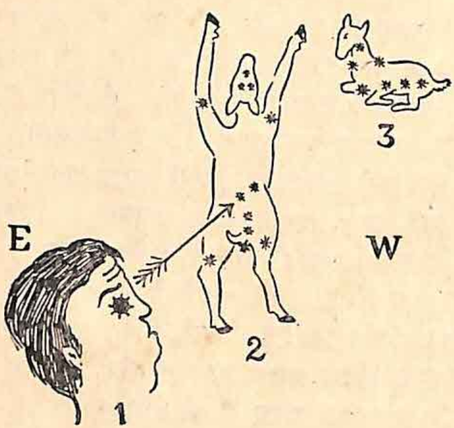
রোহিণী তারা লোহিতবর্ণ। মৃগব্যাধ হইতে রোহিণী পর্যন্ত রেখা করিলে সে রেখায় ত্রিতারক (বাণ) দেখা যায়। [ঋশ্য মৃগ হরিণ নয়। ইহার চলিত নাম নীল গাই। সংস্কৃতে নীলাঙ্গ, গবয়। আকারে বাছুরের মত।]।

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। (১) প্রজাপতি মৃগ-নক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষত্রে গিয়াছিলেন। (২) রুদ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম, তাহাঁর পশুপতি নাম মৃগব্যাধ তারায় আরোপিত হইয়াছিল। মৃগব্যাধ তারা অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা দেখিয়া তাহা দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ কল্পিত হইয়াছিল।

খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণী তারায় বাসন্ত বিষুব হইত।

তৎকালে নক্ষত্র-চক্রে রোহিণীর প্রাধান্য হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্বে (২২৯ অঃ) ইহার উল্লেখ আছে। পূর্বে অভিজিৎ লইয়া অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র গণনা হইত, এখন অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়া সপ্তবিংশতি নক্ষত্র হইল। পুরাকালে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠাদি মাসের নাম ছিল না। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত সে সে নাম লিখিতেছি।

রোহিণীর বিপরীত দিকে জ্যেষ্ঠা। অতএব রোহিণীতে সূর্য আসিলে জ্যেষ্ঠায় পূর্ণিমা হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে, সে



চিত্র ১২। 1—রুদ্র, 2—ঋশ্য, 3—রোহিত মৃগ

পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব ধরা হইত। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস বসন্তঋতুর প্রথম মাস ছিল। জ্যৈষ্ঠ এই নামেই প্রকাশ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র প্রধান গণ্য হইত। আষাঢ় মাস হইতে পাঁচ মাস গতে মার্গ মাস শরৎঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহা নূতন কথা নয়, পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঋতু এক মাস পিছাইতে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর লাগে। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা হইতে ক্রমে যজুর্বেদের কালে বৈশাখ-পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব ঘটিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ হইতে পাঁচ মাস গতে কার্ত্তিক মাস শরৎঋতুর প্রথম মাস হইল।

দুই সহস্রাধিক বর্ষ মার্গ মাসে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। এখন কার্ত্তিক মাসে শরৎ বৎসরের আরম্ভ আসিয়া পড়িল। যজুর্বেদের ঋষিগণ নক্ষত্র দর্শন করিয়া কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের আদি করিয়াছিলেন। বৈশাখ পূর্ণিমায় ও কার্ত্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুব স্বীকার করিলেন।

পরিবর্তনটি সামান্য নয়। দুই সহস্র বৎসর মার্গশীর্ষ বর্ষ-চক্রের প্রথম মাস গণ্য হইয়া আসিতেছিল, এখন কার্ত্তিক মাস প্রথম ধরিতে হইল। উপাখ্যান রচিত হইল। মহাভারতের বনপর্বে (২২১ অঃ) কার্ত্তিকেয় দেবের জন্ম ও কর্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অগ্নির পুত্র অগ্নি-কুমার। এই জন্য তিনি কুমার (যুবা)। তাহাঁকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাহাঁর জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কৃত্তিকা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি। মৎস্যপুরাণে প্রকৃত ব্যাপার রহস্যাবৃত হইয়াছে। সেখানে কুমার রুদ্র-স্থানীয় মৃগব্যাধ তারা হইয়াছেন। রুদ্রের প্রকৃত দেহ মৃগ নক্ষত্র। তাহা এই উপাখ্যানে এক অসুর কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে রুদ্রকে স্বর্গের অসুর বলা হইয়াছে। অসুরের দেহ তারায় গঠিত। এই হেতু নাম তারকাসুর। এই তারকাসুর বধের নিমিত্ত কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বধ করিতে পারেন নাই। যে তারকাসুর, সে-ই মহিষাসুর। তাহার আকার আরণ্য মহিষের তুল্য। এই হেতু মহাভারতে (বনপর্ব ২২৯ অঃ) কুমার কার্ত্তিকেয় মহিষাসুর বধ করিয়াছেন।

কবে তারকাসুর নিহত হইয়াছিল? মহাভারত বলিতেছেন, অগ্রহায়ণ শুক্ল প্রতিপদে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। তিনি ছয় দিনের মধ্যেই তেজীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। শুক্ল পঞ্চমী-যুক্ত ষষ্ঠীর দিনে তিনি দেবসেনা-পতি পদে বৃত হইলেন। পাঁজিতে সে দিন গুহ ষষ্ঠী নামে খ্যাত। গুহ কার্ত্তিকেয়।

চান্দ্র মাস গণনার দুই রীতি আছে। কেহ অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা, কেহ পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা মাস গণনা করেন। পাঁজিতে অমান্ত মাসের নাম মুখ্য চান্দ্র এবং পূর্ণিমান্ত মাসের নাম গৌণ চান্দ্র।

বৈশাখ অমায় বাসন্ত বিষুব হইলে ছয় মাস গতে অর্থাৎ কার্ত্তিক অমাবস্যা গতে অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে শারদ বিষুব হয়। ছয় মাসে ছয় তিথি পূর্ণ হয় না, পঞ্চমী-ষষ্ঠী হয় (শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা পশ্য)।

গণিত দ্বারা জানিতেছি, যজুর্বেদ কালে ও তাহারও পূর্বে উত্তর ভারত (২৮°-৩০° অক্ষাংশ) হইতে দেখিলে শরদাদ্যে মধ্য রাত্রে ব্যাধসহ মৃগনক্ষত্রের উদয় হইত। দুই এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এই মৃগয়া ব্যাপার দেখা যাইত, যেন ব্যাধরূপিণী চন্ডী মহিষরূপী অসুর বধ করিতেছেন। বোধ হয় পৌরাণিক ইহাকে অবলম্বন করিয়া মহিষাসুর-বধ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে দেখা গেল, এক ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি হইয়াছে। ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে আর্যপিতামহগণ এক রোগের শান্তির নিমিত্ত রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে শরৎঋতু-যজ্ঞ করিতেন। তাহাঁরা রুদ্রের এক তারাময় প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রুতগামী কাল সে কল্পনা ভাঙিগয়া দিল। শরৎঋতুতে মৃগের উদয় হইল না, রোহিণীর উদয় হইল। এক উপাখ্যান রচিত হইল, কাল-রূপ প্রজাপতির দুষ্কৃত মনে হইল, প্রজাপতি রোহিণীতে পলায়ন করিলেন। এখানেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, কৃত্তিকাতে চলিয়া গেলেন। খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দের কথা। রুদ্রের দেহে এক অসুর কল্পিত হইল, রুদ্র স্থানে রুদ্রাণী আসিলেন, রুদ্রের তারাময় প্রাচীন প্রতিমায় অসুর ও রুদ্রাণী, উভয়েই স্থান পাইলেন। অতএব বর্তমান দুর্গাপ্রতিমা কল্পনায় যজুর্বেদের কালের ঘটনা আশ্রয় হইয়াছে। সুর-গঙ্গার সন্নিকটে রুদ্রাণীর প্রতিমা। সুর-গঙ্গা শ্বেত হিমবান্ পর্বত। রুদ্রাণী হৈমবতী উমা হইলেন। কিন্তু উমা মহিষাসুর বধ করেন নাই। যিনি করিয়াছেন, তিনি অ-শরীরী যাবতীয় দেবের সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ।

৪

দুর্গার প্রতিমা

মোহন-জো-ডেরো স্থানে আবিষ্কৃত পুরাকৃতির মধ্যে কতকগুলি মৃন্ময় ছোট ছোট নারী-পুত্তলিকা পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি ভূষণে অলংকৃত, কিন্তু নগ্ন। প্রাজ্ঞেরা বলিতেছেন মাতৃদেবীর মূর্তি, ভাবুকেরা বলিতেছেন দুর্গা কিম্বা দুর্গার পূর্বরূপ। ইহাঁদের উক্তিতে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় সেসব ছেলেখেলার পুতুল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি বঙ্গদেশের গ্রামের ও কটকের জাতে (মেলায়) তেমন পুতুল অনেক দেখিয়াছিলাম। সেগুলি অলংকৃত ও বস্ত্রাবৃত। মোহন-জো-ডেরোর আবিষ্কৃত নারীমূর্তি যে ছেলেদের পুতুল নয়, তাহার প্রমাণ কি? ভারত-পুরাকৃতির অধ্যক্ষ শ্রীযুত দীক্ষিত মহাশয়কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিতে পারেন নাই, কারণ পূজার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি যে পুতুল দেখিয়াছি সে পুতুল কোথায় পাওয়া যায়।

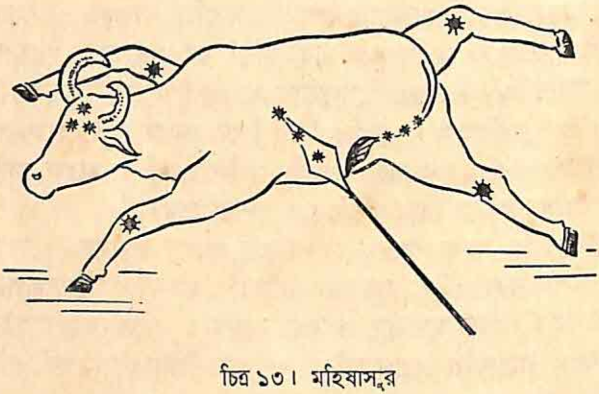
পুরাকৃতির সঙ্গে অনেক লিঙ্গচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীন সিন্ধুবাসী লিঙ্গোপাসক ছিল। ঋগ্‌বেদে লিঙ্গোপাসকের নিন্দা আছে। ঋগ্‌বেদে রুদ্র ভয়ংকর দেবতা। ভয়ে কেহ তাহাঁর নাম করিত না। রুদ্রাণীর উল্লেখ নাই। থাকিলে তিনিও ভয়ংকরী হইতেন, মাতৃমূর্তি হইতেন না।

যাহাঁরা মনে করিয়াছেন, সেসব পুত্তলিকা দুর্গা কিম্বা তদনুরূপ আর্যদেবীমূর্তি, তাহাঁরাও এই অনুমানের প্রমাণ দেন নাই। ঋগ্‌বেদে কয়েকটি দেবীর নাম আছে এবং কয়েকটির স্তুতিও আছে, কিন্তু তাহাঁদের মধ্যে কেহই দুর্গাস্থানীয় হইতে পারেন না। ঋগ্‌বেদের উষা বহুস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু উষা এক প্রাকৃতিক আলোক। দুর্গার গুণ ও কর্ম উষাতে নাই।

কেহ বলিয়াছেন, অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় মাতৃদেবী-পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যদি মিশর

ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের দুর্গাপূজা আসিয়া না থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে মাতৃদেবীর পূজা ছিল, কোন্ দেশে ছিল না, তাহা জানিয়া দুর্গাপূজার ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। নারী-মূর্তি-পূজা সহজাত সংস্কার নয় যে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিবে।

বস্তুতঃ আমরা মাতৃদেবীর পূজা করি না, মহিষমর্দিনীর পূজা করি, চণ্ডীর করি। তাহাঁকে অম্বিকা বলিতেছি বটে, কিন্তু তিনি অম্বামূর্তিতে পূজিত হন না। পূর্ব প্রকরণে দেখিয়াছি, মহিষমর্দিনী রুদ্রের যজ্ঞাগ্নি। রূপকে তিনি অম্বিকা। যিনি রুদ্র, তিনিই অম্বিকা।



চিত্র ১৩। মহিষাসুর

ঋগ্‌বেদে মৃগনক্ষত্র রুদ্রপ্রতিমা-কল্পনার আশ্রয় হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের অন্তিমকালে খ্রী-পূ ৩৫০০ অব্দে ব্যাধরূপে পশুপতি বাণদ্বারা মৃগ বধ করিতেছেন। ঋগ্‌বেদে এই মৃগ ভীম. যেমন আরণ্য বরাহ, আরণ্য মহিষ। সেই পৃথক্-ভূত রুদ্র বা রুদ্রাণী মহিষমর্দিনী হইয়াছেন। যাহা পূর্বকালে রুদ্রের শরীর ছিল, তাহা মহিষের শরীর হইয়াছিল। ব্যাধ, মৃগ-ব্যাধ তারা, দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ। পশুপতি স্থানে চণ্ডী আসিয়া শূলদ্বারা মহিষাকার অসুরের দেহ বিদ্ধ করিতেছেন (চিত্র ১৩)। ইহা নিত্য ব্যাপার।

কালান্তরে এই মূলের কিছু কিছু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, তথাপি মূলের লক্ষণ থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহেশের ধ্যান স্মরণ করি। তিনি চতুর্হস্ত। তিনি "পরশুমৃগ-বরাভীতিহস্ত।" তাঁহার হস্তে পরশু, মৃগ, বর ও অভয় আছে। এইরূপ চতুর্হস্ত মহেশপ্রতিমা আছে। তিনি কোথা হইতে পরশু ও মৃগ পাইলেন? রুদ্রিয় মরুদ্‌গণের হস্তে বাশি (ছুতারের বাইশ) আছে। সেই বাশি মহেশের পরশু। মৃগ, যে মৃগ আকাশে পলায়ন করিতেছে। তাহাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। এই ব্যাঘ্র চিত্র-ব্যাঘ্র। মরুদ্‌গণের মাতা পৃষতী (চিত্রমৃগ), (কারণ মৃগ-নক্ষত্র তারাময়)। ইহা হইতে মহেশ ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন। মহেশের রূপ বৈদিক কল্পনা। বিশেষতঃ তিনি বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিলভয়হর, প্রসন্ন। দুর্গাও বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ, ও নিখিল-ভয়-হারিণী, ভক্তের প্রতি প্রসন্না। এই কারণে আমরা দুর্গাপূজা করিয়া থাকি।



চিত্র ১৪। মহিষমর্দিনী—মধ্যভারতে নাগোড রাজ্যে আবিষ্কৃত। পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে নির্মিত।

বস্তুতঃ আমরা ভাবের পূজা করি, মূর্তির পূজা করি না। দুর্গার মূর্তি থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্মা, শক্তিরূপিণী, চিন্ময়ী। অথবা বিশ্বই তাহাঁর অবয়ব। তিনি প্রত্যেক অবয়বে বর্তমান। সে অবয়ব তাহাঁর প্রতীক। আমরা দুর্গার মূর্তি বলি না, বলি দুর্গার প্রতিমা, গুণ ও কর্মের প্রতিমা। প্রতিমা শব্দ শুক্ল যজুর্বেদে (৩২।৪৩) আছে। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" অত্র মহীধর—"তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানম্ কিঞ্চিদ্‌বস্তু নাস্তি।" পুরুষের প্রতিমা নাই,

প্রকৃতির আছে। প্রতিমা জড়ময়ী না হইয়া বাঙ্ময়ী হইতে পারে। আর যিনি ধ্যানে অগম্যা তাহাঁর পূজাও নাই। কিন্তু কেবা তাহাঁর গুণ ও কর্মের ইয়ত্তা করিতে পারে? প্রতিমা ভাবস্ফুরণের আশ্রয় মাত্র। মহিষমর্দিনী প্রতিমা দেখিলে ভক্তের মনে হয়, তিনি বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। প্রসন্ন হইলে তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দ্বারা রক্ষা করিবেন।



চিত্র ১৫। মহিষমর্দিনী। দক্ষিণ আর্কট ডিষ্ট্রিক্টে আবিষ্কৃত

মহিষমর্দিনী-প্রতিমায় উগ্রচণ্ডী শূলদ্বারা এক মহিষ বিদ্ধ করিতেছেন। ইহাই মূলরূপ। এইরূপ প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ১৪, ১৫)। মহিষ যে অসুর, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত মস্তকটি মহিষের, নিম্নাঙ্গ নরাকার হইবার কথা। বস্তুতঃ এইরূপ প্রতিমাও আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ১৬, ১৭)। ইহা নূতন নয়। বরাহ অবতারের প্রতিমায় মস্তকটি বরাহের, নিম্নাঙ্গ মনুষ্যের। দশভুজা দুর্গার ধ্যানে অসুরের ঊর্ধ্বাঙ্গ দ্বিভুজ, খড়্গ-খেটকধারী, নিম্নাঙ্গ চতুষ্পদ মহিষ। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রতিমা নির্মিত হইত। শত বৎসর পূর্বেও ছিল। এখন পূর্ববঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ আছে। অদ্যাপি বাঁকুড়া জেলায় বেলিয়াতোড় গ্রামে এইরূপ প্রতিমা নির্মিত হইতেছে। প্রথমে সিংহ বাহন ছিল না। পরে রুদ্রের কুক্কুর সিংহ হইয়াছে।

কালিকা পুরাণে (৬০।১৫৫) চন্দ্রশেখর চণ্ডিকাকে বলিয়াছেন, "হে জগন্ময়ী দেবি! মহিষশরীর আমারই। পূর্বে তুমি আমাকে বধ করিয়াছ, পরেও করিবে।" পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান দশভূজা-প্রতিমায় ছিন্ন মহিষমুণ্ড পৃথক প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু সে মুণ্ড যে শূলবিদ্ধ অসুরের, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোথাও শিল্পীরা এই মহিষমুণ্ড ত্রিনয়ন না করিয়া দ্বিনয়ন করিয়া থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়।



চিত্র ১৬। মহিষমর্দিনী। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে আবিষ্কৃত। ভারত পুরাকৃতি ভবনে রক্ষিত। একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দে নির্মিত।

বর্তমানে দুর্গাপ্রতিমার সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশের প্রতিমাও সন্নিবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গারই শক্তি। সুতরাং তাহাঁদের প্রতিমা প্রদর্শনের হেতু নাই। কার্ত্তিক গণেশ প্রতিমাও অকারণ আসিয়াছে। এই চারি প্রতিমা-সন্নিবেশ দ্বারা দুর্গার মহিমা খর্ব হইয়াছে। দুর্গা কুমারী। তাহাঁর পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গাপূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে। পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গার কন্যা নহেন। দুর্গা কার্ত্তিক গণেশের মাতা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ গণেশ বিঘ্নবিনাশন রুদ্রেরই বিকৃত মূর্তি। কার্ত্তিকের মাতা

কৃত্তিকা, পিতা অগ্নি। চারি শত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশের পূজার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় শত বৎসর পূর্বে এই চারি প্রতিমা দশভুজা প্রতিমার সহিত নির্মিত হইত না। অদ্যাপি মধ্যপ্রদেশে, যেমন জব্বলপুরে, সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভুজার প্রতিমার পার্শ্বে অন্য প্রতিমা নির্মিত হয় না। আসামে অষ্টম ও নবম খ্রীষ্ট শতাব্দের উগ্র চণ্ডা প্রভৃতি অনেক দুর্গাপ্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকাংশ মহিষমর্দিনী নহে, সিংহবাহিনীও নহে।

এই পর্যন্ত দুর্গাপ্রতিমা বুঝিতে কষ্ট নাই। কিন্তু মহাভারতোক্ত দুর্গাস্তবে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে দুর্গা যশোদা-গর্ভ-সম্ভূতা। তিনি ভদ্রকালী অর্থাৎ কালীরূপা। কেমন করিয়া তিনি দুর্গা হইলেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। কে যশোদা, কিছুই জানি না।

কথাটি সামান্য নয়। একটু বিস্তার করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণ হইতে ভদ্রকালীর উৎপত্তি লিখিতেছি। পুরাণপাঠক জানেন, মুখ্যচান্দ্র (অমান্ত) শ্রাবণমাসে কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে ভগবান্ হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সেই রাত্রে নবমীতে জগতের ধাত্রী "যোগনিদ্রা মহামায়া" যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, "বিষ্ণুরূপ সূর্য আবির্ভূত হইলেন।" বসুদেব স্বীয় বালককে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার "নীলোৎপল-দলশ্যামা" কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। কংস সে কন্যাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে কন্যা আকাশে রহিলেন এবং আয়ুধের সহিত অষ্টমহাভুজবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ পূর্বক আকাশ-মার্গে অন্তর্হিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, যশোদার এই কন্যা নীলবর্ণা, অষ্টভুজা মহাকালী। ইন্দ্র মহাকালীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রকালী শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণও এই কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত-মতে তিনি কংসাসুরঘাতিনী। মথুরার রাজা কংস অসুর ছিলেন অথবা কংসাসুর নামে কোন অসুর উদ্দিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। শুম্ভ-নিশুম্ভ নামের দৈত্য-কল্পনার মূলে নিশ্চয় কোন নক্ষত্র ছিল।

এখন কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি। গোপাল কৃষ্ণ ইন্দ্র, ইহা 'রাস-যাত্রা' প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি। মুখ্য শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে অম্বুবাচী হইত। এই কারণে ঘোর দুর্যোগ, সেদিন গোপালের জন্ম হইয়াছিল। অষ্টমী গতে নবমীতে ভদ্রকালী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ভদ্রকালী ইন্দ্রযজ্ঞ-রূপা। ধূম অগ্নির পতাকা, ঋগ্‌বেদে আছে। যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নিও আছে। এই ন্যায়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গাঢ় নীল নয়, আ-নীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিম্বা অতসীর ফুল। বস্তুতঃ তিনি যজ্ঞিয় অগ্নি। এই অগ্নি শক্তিরূপ দেবের প্রতিনিধি। ইন্দ্ররূপ কৃষ্ণ কংসরূপ অসুরবধ করিয়াছিলেন। পুরাণ ভদ্রকালীর আবির্ভাবের হেতু বলেন নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বৈদিক কালের ইন্দ্রকর্তৃক অসুরবধ ও ইন্দ্র-যজ্ঞ স্মরণ করিয়াছেন।

দেখি, কতকাল পূর্বের ঘটনা। যজুর্বেদের কাল হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় শারদ বিষুব ধরা হইত। ইহা হইতে গণিয়া গেলে শ্রাবণপূর্ণিমায় নয় চান্দ্র মাস হয়। নয় চান্দ্র মাস গতে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী-নবমীতে অম্বুবাচী ঘটে। সেদিন ভোর রাত্রে ভদ্রকালী আকাশে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, মৃগ নক্ষত্রই ভদ্রকালী কল্পনার আধার হইয়াছিল। ব্যাধ তারা লইয়া গণিত দ্বারা জানিতেছি, যজুর্বেদের কালে এই নক্ষত্র দক্ষিণায়ন-আরম্ভ কালে ভোর ৪টার সময় উদিত হইত। প্রথমে মৃগ, পরে ব্যাধ। রবিকরে প্রথমে মৃগ, পরে ব্যাধ অদৃশ্য হইত, যেন ব্যাধ মৃগ বধ করিয়াছে। দুই এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এইরূপ দেখা যাইত। বর্ষা ঋতুর সূচনা করিত বলিয়া আকাশে উদয় নিরীক্ষিত হইত। অম্বুবাচীর দিন যজ্ঞ হইবার কথা। অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত হইত। সেই অগ্নি ভদ্রকালী, অধর-অরণি (পাতন) যশোদা। সে নক্ষত্র শরৎঋতু-আরম্ভে মধ্যরাত্রে উঠিত। বোধ হয় এইরূপে অম্বুবাচীর ভদ্রকালী পরে দুর্গা হইয়াছেন। আরও মনে হয় দুর্গাপূজাপ্রচলনের পূর্বে ভদ্রকালীর পূজা হইত। পরে দুর্গা-পূজা আসিয়াছে, কিন্তু শরৎঋতুতে।

মথুরায় পুরাকৃতি-ভবন আছে। সেখানে বেরেলী জেলায় আবিষ্কৃত

মহিষমর্দিনী প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে। অবেক্ষক মহাশয় জানাইয়াছেন, সেসব প্রতিমা, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে বোধ হয় অন্বেষণ করিলে খ্রীষ্টাব্দের দুই এক শত বৎসর পূর্বের ভদ্রকালীর প্রতিমা পাওয়া যাইবে। বিন্ধ্যাচলে এক দেবী-প্রতিমা আছেন। কোন্ দেবী-প্রতিমা, কত কালের প্রতিমা, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। তিনি পুরাণোক্ত বিন্ধ্যবাসিনী হইতে পারেন।

এক্ষণে বর্তমান প্রচলিত দশভুজা দুর্গার প্রতিমা অবলোকন করিতেছি। মৎস্যপুরাণে নানা দেবদেবীর প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত আছে, দশভুজা দুর্গারও আছে। সেখানে দুর্গা অতসীপুষ্পবর্ণাভা। দুর্গাপ্রতিমার কি বর্ণ হইবে? অতসীপুষ্প আ-নীল। অতসীর বাঙলা নাম তিসী। নদীয়া জেলায় ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহার বীজের নাম মসৃণা, বাঙলায় মসিনা। মসিনার তেল রং মিশাইতে লাগে। এ কারণে বঙ্গের নানা স্থানে তিসীর চাষ আছে। শ্রীকৃষ্ণ অতসীকুসুম-শ্যাম। ইহা প্রসিদ্ধ। বৃহৎ সংহিতায় উজ্জয়িনীর বরাহ-মিহির (ষষ্ঠ খ্রীষ্ট শতাব্দ) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবীর এই বর্ণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের যে বর্ণ, মৎস্য পুরাণের মতে দুর্গারও সেই বর্ণ। যশোদা-গর্ভসম্ভূতা ভদ্রকালীরও সেইবর্ণ। কালিকা পুরাণে ভদ্রকালী অতসী-পুষ্পবর্ণা। ভদ্রকালী অবশ্য কালী (কৃষ্ণা)। দক্ষিণ ভারতের চিত্রকারেরা দুর্গা চিত্রের সেই বর্ণই করেন।*

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইন্দ্রাদির স্তবে দেবীর বর্ণ লিখিত হইয়াছে। "উদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি"—গোপাল চক্রবর্তীর টীকা অনুসারে অর্থ, উঠিবার সময় পূর্ণচন্দ্রের যে বর্ণ দেখা যায়, সে বর্ণ। ("ক্রোধেনারক্তী-ভূতত্বাৎ")। সে বর্ণ আরক্তপীত। দেবীর দেহের কান্তি "কনকোত্তম-

---

* আমার কাছে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত "শ্রীদুর্গা"র এই বর্ণের চিত্র আছে। নাম "ভূগোল চিত্রং"। মহিসুর মাহারাজর পরিপোষিত "কৃষ্ণ মূর্ত্যাচার্যেন বিরচ্য প্রকাশিতম্"।

Sole proprietor:—
P. Rajagopaul Naidu.
Bidens garden Vepery. Madras.

কান্তি” সদৃশ। উৎকৃষ্ট সুবর্ণের যেমন কান্তি, দীপ্তি। তদনুসারে কালিকা-পুরাণে দুর্গা “তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা”। বঙ্গদেশের দুর্গা প্রতিমা এই বর্ণের হয়। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য “দুর্গার্চন-পদ্ধতি” লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মৎস্য পুরাণোক্ত কাত্যায়নী দশভুজার প্রতিমা-লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গা “অতসীপুষ্প-বর্ণাভা”। কিন্তু তিনি অতসী শব্দে শণ বুঝিয়াছেন। অতসীপুষ্প আ-নীল বর্ণ। কোন কোন ফুলে রক্তের আভা মিশ্রিত হইয়া থাকে। শণ শুদ্ধ পীত বর্ণ। দোড়ির নিমিত্ত শণের বিস্তর চাষ হয়।*

ধ্যানে আছে, জটাজূট-সমাযুক্তা। প্রতিমায় জটা দেখিতে পাই না। অর্ধেন্দু শিরোভূষণও দেখি নাই। ধ্যানের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মহিষাসুরের দেহের ঐক্য নাই, পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মৎস্য-পুরাণ প্রতিমার লক্ষণ দিয়াছেন, ধ্যানমন্ত্র দেন নাই। এই কারণে “ত্রিশূলং দক্ষিণে দদ্যাৎ, পরশুং সন্নিবেশয়েৎ, মহিষং বিশিরষ্কং প্রদর্শয়েৎ, সিংহং প্রদর্শয়েৎ” ইত্যাদি কর্মসূচক ক্রিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত

---

* বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবি লোচনদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের বর্ণ অতসীকুসুম তুল্য। শ্যামদাস লিখিয়াছেন, “অতসীকুসুম জিনি তনু”,—সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত অপ্রকাশিত “পদরত্নাবলী”। পূর্ববঙ্গে এক বিস্ময়কর ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর পূর্বপার্শ্ব হইতে ত্রিপুরা মৈমনসিং পর্যন্ত শণ-পুষ্পীর নাম অতসী হইয়া গিয়াছে! অমরকোশে, “অতসী স্যাৎ উমা ক্ষুমা”। অতসীর নাম উমা ও ক্ষুমা। ক্ষুমার অংশু হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের নাম ক্ষৌম। তিন-চারি শত বৎসর ক্ষৌম অজ্ঞাত হইয়াছে। হিমালয়-দুহিতার নাম উমা ছিল। তিনি কৃষ্ণা ছিলেন, “নীলোৎপলদলচ্ছবি”। মৎস্য-পুরাণে ও কালিকা-পুরাণে বিস্তারিত আছে। বোধ হয় সেই বর্ণহেতু অতসীর এক নাম উমা হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ভিদ্ উমার কোন প্রয়োগ পাই নাই। অমরকোশে শণ-পুষ্পীর এক নাম ঘণ্টারবা। ইহা বন্যবৃক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে নাম বনশণা, ঝন্‌ঝনা বা ঝুন্‌ঝুনি। ইহার ফুল শন ফুলের তুল্য, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। ফল শুঁটি, পাকিয়া শুখাইলে বাতাসে নাড়িয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে। এক কবি খেদ করিতেছেন, “সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি। আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে”। সুবর্ণ-সদৃশ পুষ্প দেখিয়া মনে হইল ইহার ফল রত্ন হইবে, এই আশায় বৃক্ষটির সেবা করিতে থাকিলাম। কিন্তু ফল সুপক্ব হইলে ঝন্‌নঝ্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই হইল না।

শুনিয়াছি, কোথাও কোথাও শিল্পী দুর্গা প্রতিমাকে চম্পকবর্ণা করেন, ইহা অশাস্ত্রীয়। যিনি অগ্নিবর্ণা, অগ্নি-স্বরূপা, তিনি চম্পকবর্ণা কিছুতেই হইতে পারেন না।

দশভুজার রূপ পাইতেছি। তাহাঁর গুণের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় ইহাকে কারিকা (বিবরণ) বলিয়াছেন, মন্ত্র বলেন নাই। ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই ধ্যান অনুসারে সকল মহিষ-মর্দিনীপ্রতিমা নির্মিত হইত না, কিন্তু অন্য লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

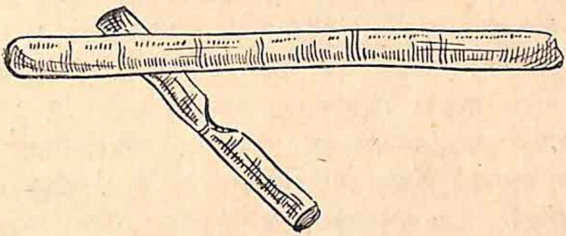
অরণি

পরে অরণি আবশ্যক হইবে। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে অরণি অজ্ঞাত। এই হেতু অরণি-নির্মাণ সবিস্তার লিখিতেছি। বহু-কাল পূর্বে আমি কটকে গণিয়ারি ও অশ্বত্থের অরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। অশ্বত্থের দুই জাতি আছে। এক জাতির পাতার আকার পানের মত। অগ্রভাগ দীর্ঘ, ইহাই প্রকৃত অশ্বত্থ। অন্য জাতির পাতা হ্রস্ব, অগ্র দীর্ঘ নয়। ইহার সংস্কৃত নাম অশ্বত্থী, গজাশ্বত্থ; বাঙলা নাম গয়া-আশুত্। দুই অশ্বত্থই গজভক্ষ, কিন্তু ইহার কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম। এই হেতু গজের আরও প্রিয়। নরম কাঠের অরণি ভাল হয় না। গণিয়ারি বৃক্ষের সংস্কৃত নাম গণিকারিকা। (অ-গ্নি-কারিকা)? অপর নাম অগ্নিমন্থ, অরণি, জয়া, জয়ন্তী। অগ্নিমন্থ চিরহরিৎ ছোট তরু। কাষ্ঠ সুগন্ধ, পাতাও সুগন্ধ। ডাল সহজে ভাঙিগয়া যায়। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার। আয়ুর্বেদে দশমূল পাচনে ইহার মূল লাগে। ইহা সর্বত্র জন্মে না। বঙগদেশের কবিরাজেরা ইহার এক সগোত্র অন্য এক গাছকে গণিয়ারি বলেন। ইহার কাঁটা আছে। গণিকারিকার কাঁটা নাই। অগ্নিমন্থ হইতে ওড়িয়া নাম অগবথু। বৈজ্ঞানিক নাম Premna integrifolia।

ওড়িষ্যার বহু স্থান জাঙগল, বাঁকুড়ারও অনেক স্থান জাঙগল। জাঙগল দেশে অরণি বহু প্রচলিত আছে। অরণিকে বাঁকুড়ায় 'আগুন খাড়ি' অর্থাৎ আগুন কাঠি বলে। রাখাল বালকেরা বনের ধারে গোরু চরাইতে যায়। আগুন খাড়ি দিয়া আগুন করিয়া 'চুটি' (শাল পাতায় জড়ান তামুক পাতা) খায়। সাঁওতালেরা আগুন করিতে দক্ষ। অড়হর,

বিশেষতঃ টুমুর (অড়হরের বড় জাত), কুড়চি (সংস্কৃত নাম কূটজ), শাওড়া, আশুত্, কদাচিৎ বেল ও বাবলা প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ যে কোন নাতিঘন, নাতিকঠিন, নাতিকোমল কাঠে অরণি হইতে পারে।

ইহার নির্মাণক্রম এই। দুইখানি কাঠে অরণি হয়। একখানি মোটা, অপর খানি আঙ্গুলের তুল্য সরু সোজা, তিন পোয়া লম্বা। মোটা কাঠে একটি অগভীর গর্ত করিয়া, গর্ত হইতে কাঠের পাশ পর্যন্ত একটি ত্রিকোণ নালী কাটিতে হয় (চিত্র ১৯)। এই কাঠের নাম পাতন। পাতনের তলায় শুখ্না পাতা রাখা হয়। দুই পায়ের আঙ্গুল দিয়া পাতন টিপিয়া ধরিয়া নালী কোলের দিকে রাখিয়া, কাঠখানির মোটা



চিত্র ১৯। অরণি

মুখ গর্তে চাপিয়া দুই হাতে মথিতে হয়। উপর হইতে নীচে হাত চলিতে থাকে। ঘর্ষণে কাঠের 'ভুরা' (ধূলা) হয়, ভুরায় আগুন ধরে, নালী দিয়া পাতায় পড়ে, পাতা জ্বলিয়া উঠে। দুই মিনিটে আগুন পাওয়া যায়। সরু কাঠটির নাম দাঁড়া। সংস্কৃতে পাতনের নাম অধর-অরণি (নিম্নস্থ অরণি), দাঁড়ার নাম উত্তর-অরণি (ঊর্ধ্ব-অরণি), অপর নাম প্রমন্থ। এইটি নর, নীচেরটি নারী। এই দুই নাম সাঁওতালের মুখে ও ওড়িষ্যায় শুনিয়াছি। নর-নারীর সংযোগে গর্ভ হয়, গর্ভই অগ্নি। নর-নারী এক গাছের কাঠের না হইয়া দুই গাছের হইতে পারে। ঋগ্‌বেদে নর-নারীর নাম পিতামাতা, অগ্নি শিশু, কুমার। দুই হাতের দশ অঙ্গুলিকে দশ ভগিনী বলা হইত।

দুই জন লাগিলে পরিশ্রম কম হয়। এক জন প্রমন্থের মাথায় একটা কঠিন কাঠের গর্ত চাপিয়া ধরে। অন্য এক জন দোড়ি দিয়া প্রমন্থ এদিক-ওদিক 'দধিমন্থনে'র মতন টানিতে থাকে। প্রমন্থ মোটা করিতে হয়, মোটা কাঠে আগুন বেশী হয়। বোধ হয় বৈদিককালে অরণি-নির্মাণ এই পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত "শতপথ ব্রাহ্মণে"র বঙ্গানুবাদের পরিশিষ্টে চিত্র ও বর্ণনা দিয়াছেন।

আমি পূর্বে বেল কাঠের অরণি শুনি নাই। বেলকাঠ ঘন ও কঠিন। ইহার অরণি দ্বারা আগুন করা সোজা মনে হয় নাই। এক ভাদ্রমাসে সূত্রধরের ভ্রমরযন্ত্রের লোহার ফলার স্থানে বেলকাঠের সরু ফলা আঁটিয়া বেলকাঠের পাতনে মথিয়া আগুন পাইয়াছি। দুইটি কাঠই রসা ছিল। বন্য বিল্ব ও গ্রাম্য বিল্ব, দুই জাত। বন্য বিল্ব পাহাড়ে ও উচ্চ বনভূমিতে জন্মে। পাতা কাঁটা ও ফল দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। অরণির পক্ষে ইহার বিশেষ গুণ আছে কিনা দেখা হয় নাই।

শিবের গাজনে 'গামার কাটা' এক বৃহৎ পর্ব। কেহ ইহার প্রয়োজন জানে না। আমার বোধ হয়, অরণি নির্মাণের নিমিত্ত এই কাঠ খুঁজিতে হয়। গামার সংস্কৃত নাম গম্ভারি। কিন্তু গামার কাঠ হালকা, নরম। ভ্রমর দ্বারা রসা কাঠে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘর্ষণে ও চাপে ঘৃষ্ট স্থান মসৃণ হইয়া গেল, ভুরা বাহির হইল না। তখন অল্প বালি দিতে আগুন বাহির হইল। শিবের গাজন গ্রীষ্মকালে হয়। তখন কাঠ শুখ্না থাকে, ভুরাও বাহির হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে অগ্নিগর্ভা শমী প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ শমী কাষ্ঠে অগ্নি আছে। ঋগ্‌বেদে শমীর অরণির উল্লেখ আছে। শমী বাবলা গাছের তুল্য (চিত্র ২০)। ইহার কাঁটা ছোট সোজা শক্ত। এত গাছ থাকিতে ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ এই কণ্টকী বৃক্ষের অরণি কেন করিতেন, প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে জানিয়াছি পঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর অঞ্চলে শমী বৃক্ষ অপর্যাপ্ত। অশ্বত্থ দুর্লভ, পূর্বকালে অশ্বত্থ ছিল না। সেখানে অশ্বত্থ রোপণ ও পালন করিতে হয়, যত্রতত্র আপনি জন্মে না। উর্বশী-পুরূরবা-সংবাদ হইতে জানিতেছি, গন্ধর্বেরা

পুরূরবাকে অশ্বত্থের অরণি করিতে শিখাইয়াছিল। পুরূরবার দেশ আগ্রা প্রদেশ, পঞ্জাব হইতে পারে না। অথর্ববেদের দেশও সেই দেশ, পঞ্জাব নয়। সে বেদে অশ্বত্থ বট পর্কটীর নাম আছে। এইসকল বৃক্ষ পঞ্জাবের নয়, উত্তর ভারতের। বিরাটনগরে প্রবেশের পূর্বে পাণ্ডবেরা তাহাঁদের অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া এক শমীবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। শমীর বাঙ্গালা নাম শাঁই, বৈজ্ঞানিক নাম Prosopis spicigera।

ভারতের পশ্চিমার্ধে শমীবৃক্ষ জন্মে। পূর্বার্ধে কদাচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে শমীর অরণি লিখিত হইয়াছে। অতএব সে পুরাণ ভারতের পশ্চিমার্ধে কোথাও রচিত হইয়াছিল। বিল্ববৃক্ষ ভারতের সর্বত্র জন্মে। দেবী ভারতের পূর্বাংশে বোধ হয় পার্বত্য প্রদেশে বিল্ববাসিনী হইয়াছিলেন। পূজার মন্ত্রেও বিল্বকে পার্বত্য আবাস হইতে আসিতে বলা হয়। পশ্চিম ভারতে শমী দেবীর পবিত্র বৃক্ষ। রাজারা নীরাজন করিবার সময় আবাস হইতে দুই তিন মাইল দূরে রোপিত শমীবৃক্ষের পত্র লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিজয়াদশমীর পর বন্ধুবর্গের মধ্যে শুভ কামনায় শমী পত্রের আদান-প্রদান রীতি আছে। এক বিজয়াদশমীর পরে আমার এক মরাঠী বন্ধুকে পত্রে তাহাঁর বিজয় কামনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি পত্রের উপরিভাগে কুঙ্কুম-লিপ্ত একটি ছোট পাতা পাঠাইয়াছিলেন। সে পাতা শ্বেত কাঞ্চনের। তিনি শমী পাতা পান নাই। সেই পাতা শমীর প্রতিনিধি হইয়াছিল।



চিত্র ২০। শমী (হ্রস্বীকৃত)

বঙ্গদেশে শমী দুর্লভ। বাঁকুড়ায় শমীবৃক্ষ আছে কিনা অনুসন্ধান

করিয়াছিলাম। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উৎসাহী ইঞ্জিনীয়ার শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিমিত্ত শমীবৃক্ষ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই নগর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে ঈশান কোণে নড়রা নামে গ্রাম আছে। তাহার নিকটবর্তী শিবরামপুর গ্রামে দুইটি শমী-বৃক্ষ আছে। দৈবজ্ঞেরা পালন করিয়া আসিতেছেন। তাহাঁরা বলেন যজ্ঞকালে শমীর অরণি আবশ্যক হয়। বাঁকুড়া জেলায় আরও অনেক স্থানে শমীবৃক্ষ আছে। ইন্দপুর থানার অন্তর্গত শালডিহা গ্রামে গণকেরা দুইটি বৃক্ষ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাহাঁরা বলেন, হোমে শমীকাষ্ঠ আবশ্যক হয়। দেখা যাইতেছে, গ্রহাচার্যেরাই প্রাচীন স্মৃতি পালন করিয়া আসিতেছেন। ইঞ্জিনীয়ার আমাকে শমীর ডাল আনিয়া দিয়াছিলেন। এক সাঁওতালকে সেই কাঠের অরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দিয়াছিলাম। আগুন বাহির করিতে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অশ্বত্থের অরণিতে অল্পায়াসে আগুন বাহির হয়। তথাপি ঋগ্‌বেদের কাল হইতে শমীর অরণি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, শমী-গর্ভ শব্দের অর্থও অগ্নি হইয়া গিয়াছে। শমী-গর্ভ অশ্বত্থ, যে অশ্বত্থে অগ্নি আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতী দিয়াশলাই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ চক্‌মকি পাথর সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু ইস্পাতও দুর্মূল্য! তখন মনে হইয়াছিল, অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদন করিতে হইবে। উদ্যোগী বণিক ভ্রমর-অরণি নির্মাণ করিয়া দিয়াশলাইর অভাব পূরণ করিবেন, আমাদের পূর্বকালের অবস্থা হইবে। সভ্যতায় লোকে পরবশ হয়, অরণি দ্বারা আত্মবশ হইতে পারিবে। অশ্বত্থবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কেন পুণ্য কর্ম, এখন বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রামে কত ঘর বাস করে, কত অরণি চাই। এই হেতু অশ্বত্থবৃক্ষ কাটিতে ও পোড়াইতে নাই, শুখ্‌না ডাল কাটিতে দোষ নাই।

দুর্গাপূজা শরৎকালীন যজ্ঞ

আমরা দুর্গোৎসবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম অনুসন্ধান করিতেছি। পূর্ব পূর্ব প্রকরণে ফলও যথাজ্ঞান বিবৃত করিয়াছি। যদি দুর্গাপূজায় ও উৎসবে তাহার সমর্থন থাকে, তাহা হইলে অনুমান বিশ্বাসযোগ্য হইবে, নচেৎ কল্পনা-প্রসূত মনে করিতে হইবে। এই নিমিত্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতির কয়েকটি প্রধান অংগ অবলোকন করিতে হইবে।* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গার্চন-পদ্ধতিতে বহু ব্যবস্থার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি নিজে ব্যবস্থা করেন নাই। পূর্বকালের স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণে পদ্ধতি লিখিয়াছেন। পূর্বে পূর্বে যে পদ্ধতিতে পূজা হইত, বর্তমানেও সেই পদ্ধতিতে পূজা হইবে। পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, এখনও সেই ব্যবস্থা মানিতে হইবে। ইহা যাবতীয় স্মৃতির অভিপ্রায়। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণ সে সে ব্যবস্থার হেতু দেন নাই। যেমন, দুর্গাপূজায় কুমারীপূজন অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু দেবীপুরাণে এই ব্যবস্থা আছে। দেবীপুরাণ কেন এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, তাহা পুরাণে নাই। নিশ্চয় কোন হেতু ছিল। আমরা সেই হেতু অনুসন্ধান করিতেছি। এই নিমিত্ত কয়েকখানি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল জানিতে হইবে। নচেৎ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। পরবর্তী প্রকরণে সে বিষয়ে যত্ন করা যাইবে।

---

* মাস-সংক্রান্তি-গণনা হইতে জানিতেছি নবদ্বীপে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদিত এই স্মৃতি-তত্ত্বের শেষে "শ্রীদুর্গার্চন-পদ্ধতি" সন্নিবিষ্ট আছে। পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত "দুর্গাপূজা-তত্ত্বম্" বিস্তৃত ভূমিকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দুই ভাগ, প্রমাণতত্ত্ব ও প্রয়োগ-তত্ত্ব। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যা-বারিধি টীকা-টিপ্পনীর সহিত "কালিকা-পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতি" প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বহু বৈদিক মন্ত্র আছে। "আর্য-শাস্ত্রপ্রদীপ" প্রণেতা যোগ-ত্রয়ানন্দ "দুর্গার্চন ও নবরাত্র-তত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন। ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (প্রকাশক শ্রীনন্দকিশোর বিদ্যানন্দ, উত্তরপাড়া, হুগলী)।

প্রথমে দুর্গাপূজা-প্রকরণ স্মরণ করিতেছি। পূজার সাতটি কল্প অর্থাৎ সাতটি বিধি আছে। যথা—

১। ভাদ্রকৃষ্ণনবমী। সেদিন দেবীর বোধন করিতে হয়। তদবধি আশ্বিনশুক্লনবমী পর্যন্ত ১৬ দিন পূজা।

২। আশ্বিনশুক্লপ্রতিপদ। প্রতিপদে কেশসংস্কারদ্রব্য দিতে হয়। দ্বিতীয়ায় কেশবন্ধনের পট্টডোর, তৃতীয়ায় পদরঞ্জনের জন্য অলক্তক, ললাটের জন্য সিন্দুর, মুখদর্শনের জন্য দর্পণ, চতুর্থীতে মধুপর্ক, নেত্রের কজ্জল, পঞ্চমীতে অগুরুচন্দন প্রভৃতি অঙ্গ-রাগ দ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয়।

৩। আশ্বিনশুক্লষষ্ঠী। সন্ধ্যাকালে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন, দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৪। উক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে পূজা। সপ্তমী হইতে তিন দিন মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পূজা। পূর্বাহ্নে প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপন।

৫। শুক্ল-অষ্টমী। অষ্টমী নবমী দুই দিন পূজা।

৬। কিম্বা কেবল অষ্টমীতে পূজা এবং সেই দিনই বিসর্জন।

৭। শুক্ল-নবমী। কেবল সেই দিনই পূজা ও বিসর্জন। কেবল অষ্টমী কিম্বা কেবল নবমীতে ঘটে পূজা করা হয়।

দশমীতে বিসর্জন। সন্ধ্যাকালে ঘট ও প্রতিমা নদী কিম্বা বৃহৎ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া জল ও কর্দম লইয়া কৌতুকক্রীড়া। ইহার নাম শবরোৎসব। গৃহে প্রত্যাগমনকালে খঞ্জন পক্ষী (কিম্বা নীল-কণ্ঠ পক্ষী) দৃষ্ট হইলে শুভ। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, আত্মীয়-স্বজনের কুশল কামনা ও তদনন্তর অল্প সিদ্ধিপান প্রচলিত আছে।

এক্ষণে পূজা দেখি। ঋগ্‌বেদের কালে হিম. (শীত) ঋতু ও শরৎ ঋতু হইতে দুই বৎসর গণিত হইত। রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিম. বৎসর এবং তাহার চারি ঋতুর পরে শরৎঋতু হইতে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা পূর্বে মহিষমর্দিনী প্রকরণে বলা গিয়াছে। প্রত্যেক

ঋতু আরম্ভেই যজ্ঞ হইত। হিম.ঋতু ও শরৎঋতু আরম্ভেও যজ্ঞ হইত। শরৎকালীন যজ্ঞই রূপান্তরিত হইয়া দুর্গাপূজা হইয়াছে।

যজ্ঞের ও পূজার কর্মে প্রভেদ আছে। কিন্তু উভয়ের অভিপ্রায় একই। দেবতার প্রসাদের নিমিত্ত তাহাঁকে প্রীতিকর দ্রব্য সমর্পণের নাম যজ্ঞ। যে দ্রব্যে আমরা প্রীত হই, আমরা মনে করি, সে দ্রব্যে দেবতাও প্রীত হন। ঘৃতাহুতি যজ্ঞের এক প্রধান অঙ্গ। দুর্গাপূজায় হোম একান্ত কর্তব্য। যজ্ঞবিশেষে ঘৃতাক্ত পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) মাংস ও সোমরস দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে অর্পিত হইত। দেবতার স্তব অর্থাৎ গুণ ও কর্মের প্রশংসা উচ্চারিত হইত। ধন দাও, প্রচুর অন্ন দাও, বীর পুত্র দাও, শত্রু বিনাশ কর ইত্যাদি স্বাভাবিক মানুষের প্রার্থনা থাকিত। দুর্গাপূজাতেও তাহাই হয়। চণ্ডীমাহাত্ম্য তাহাঁর স্তব। নৈবেদ্য ও পশু-বলি দ্বারা তাহাঁকে প্রসন্ন করা হয়। আর দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করা হয়,

> "আয়ুরারোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবি নমস্তুতে।
> রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
> পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে।"

দুর্গাপূজার মন্ত্রে যজ্ঞ শব্দ বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে। "দেবি যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ," হে দেবি! যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। পশুবলি দিবার সময় বলা হয়, "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ তস্মিন্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ"। যজ্ঞের নিমিত্তই পশু সৃষ্ট হইয়াছে। সে যজ্ঞে যে বধ, তাহা অবধ। দুর্গাপূজা যজ্ঞ না হইলে পশুবলি প্রাণিহিংসায় দাঁড়ায়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, পশুচ্ছেদের সময় ভক্তদর্শকেরা "মো মো" শব্দ করিতে থাকেন। সংস্কৃত মহস্ শব্দের সংক্ষেপে এই "মো মো" আসিয়াছে। মহস্ শব্দের অর্থ যজ্ঞ।* হোমের সমুদয় ক্রিয়া বৈদিক (পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত কালিকাপুরাণোক্ত পূজা-পদ্ধতি পশ্য)। যাগ ও হোমের অনুষঙ্গে প্রভেদ আছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন, দাঁড়াইয়া

* পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ায়, "আম কাঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম ম করে।" কাঠালের পীড়ি ঘৃতসিক্ত হইয়া উৎসবগন্ধ ছড়াইতেছে।

আহুতি দিলে যাগ, বসিয়া দিলে হোম। কিন্তু কর্মে প্রভেদ নাই। দুর্গাপূজা পশুযাগ। ইহাকে সোমযাগ বলিতে পারি। সোমযাগে পশুবলি হইত ও সোমরস প্রদত্ত হইত। আমার অনুমানে বেদের সোমবৃক্ষ সিদ্ধিগাছ। সিদ্ধির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাম ভঙ্গা। বাংলায় বলি ভাং। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম বিজয়া। রঘুনন্দন বিজয়াকালে দেবীকে সিদ্ধি দিবার ব্যবস্থা লিখেন নাই। কিন্তু ইহা বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আছে।

দুর্গাপূজা বৈদিক যজ্ঞের রূপান্তর, তন্ত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তন্ত্রের উৎপত্তি বহু প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে ইহার অঙ্কুর আছে। অথর্ববেদে তন্ত্রের প্রসার হইয়াছে। তন্ত্রে রেখা দ্বারা নির্মিত প্রতিকৃতির নাম যন্ত্র। বর্ণমালার এক এক বর্ণ এক এক দেবতার দ্যোতক। এইসকল বর্ণের নাম বীজ। প্রাচীনেরা তন্ত্রকে শ্রুতি মনে করিতেন। তাহাঁরা বলিতেন, শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ইহা দেবী-ভাগবতে ও মনুসংহিতার কুল্লুক ভট্টের টীকায় আছে। দেবীপুরাণ দুর্গাপূজাকে বৈদিক বলিয়াছেন।

দেবীর বোধন

বোধন নিদ্রা-ভঞ্জন। দেবী নিদ্রিতা থাকেন। তাহাঁকে জাগাইয়া পূজা করিতে হয়। কেন নিদ্রিতা থাকেন? যেহেতু রবির উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার দিবা, দক্ষিণায়ন ছয় মাস তাহাঁদের রাত্রি। দিবা কর্মের কাল, রাত্রি নিদ্রার কাল। শরৎঋতু দক্ষিণায়নে পড়ে। দেবী তখন নিদ্রিতা থাকেন।

কালিকাপুরাণ বোধনের এই প্রয়োজন লিখিয়াছেন। কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাখ্যা পুরাণে কদাচিৎ আছে। জগন্ময়ী নিদ্রিতা, বাতুলের প্রলাপ। বোধনের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া গিয়া এই অদ্ভুত ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। কালিকাপুরাণে আরও আছে, রাবণবধার্থে রামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করিয়া পুরাকালে ব্রহ্মা দেবীর অকাল বোধন করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ আলোচনার সময় দেখা যাইবে পুরাণ-কর্তা জ্যোতিষচর্চা

করিতেন। তিনি প্রকৃত তত্ত্ব ঢাকা দিয়াছেন, অসংগতি চিন্তা করেন নাই। পরে পরে দেখাইতেছি।

প্রথম কথা, বাল্মিকী-রামায়ণে দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই। রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র আদিত্যহৃদয়স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথা, শরৎঋতুতে রামরাবণের যুদ্ধও হয় নাই। শরৎঋতু যুদ্ধকালও নয়, হেমন্ত ও বসন্ত যুদ্ধোদ্যমের কাল। ইহা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। তৃতীয় কথা, যদি দক্ষিণায়ন কালে দেবতারা নিদ্রিত থাকেন, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায়, শ্যামাপূজায়, জগদ্ধাত্রীপূজায়, কার্ত্তিকপূজায় বোধন নাই কেন? চতুর্থ কথা, সপ্তম্যাদি অষ্টম্যাদি ও কেবল অষ্টমী ও নবমীতে পূজায় বোধন করিতে হয় না কেন? আশ্বিন শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ, ষষ্ঠীর সায়ংকালে বোধন। তবে কি প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে যে পূজা হয়, তাহা নিষ্ফল? পঞ্চম কথা, নবরাত্র ব্রতে বোধন নাই কেন? ষষ্ঠ কথা, ঘটে নয়, প্রতিমায় নয়, বিল্ব বৃক্ষে, বিল্ব শাখায় দেবীর বোধন! কেন বিল্ববৃক্ষে বোধন? ইহার অর্থ কি?

এইসকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদনের নাম বোধন। বিল্বকাষ্ঠের অরণি; এই হেতু দেবী বিল্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নি-স্বরূপা। অগ্নি সকল শক্তির প্রতিনিধি। অরণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নি কুমার। তিনিই কুমারী দুর্গা। কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়।

বৃহদ্-ধর্মপুরাণে (পৃ. ২২) এই ব্যাখ্যার আভাস আছে। লিখিত আছে, "রাবণের বধার্থে ব্রহ্মাদিদেবগণ দেবীর স্তব করিলে তিনি বিল্ব-বৃক্ষে বোধন করিতে বলিলেন। তাহাঁরা ভূতলে আসিয়া এক দুর্গম নির্জন স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষ দেখিলেন। তাহার এক পত্রে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা সুরুচিরা অচিরপ্রসূতা এক বালিকা নিদ্রিতা। বালিকা অনাবৃতাঙ্গা, নিশ্চেষ্টা। দেবগণের স্তবে বালিকা প্রবুদ্ধা হইয়া যুবতীরূপ ধারণ করিলেন।" অতএব দেখিতেছি বিল্ববৃক্ষের কুমারীর জন্ম হয়। কুমারীকে শুষ্ক বিল্বপত্রে প্রথমে নিদ্রিতা পরে প্রবুদ্ধা দেখা যায়।

শমী-কাষ্ঠই অরণির প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ, ঋগ্‌বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজা-যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নি উৎপাদন আবশ্যক। শমীবৃক্ষ ভারতের পশ্চিমাংশে সুলভ, কিন্তু পূর্বাংশে দুর্লভ। বঙ্গ-দেশে প্রায় অজ্ঞাত। দেখা যাইতেছে, যে দেশে শমীবৃক্ষ দুর্লভ, সে দেশে বিল্ব কাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন প্রচলিত হইয়াছিল। অমরকোশে বিল্ববৃক্ষের এক নাম শাণ্ডিল্য; মেদিনীকোশে এক অগ্নির নাম শাণ্ডিল্য এবং শাণ্ডিল্য এক মুনির নাম। বোধ হয় শাণ্ডিল্য গোত্রের কোন ব্রাহ্মণ বিল্বকাষ্ঠের অরণি প্রচলিত করিয়াছিলেন।

পূর্বকালে রাক্ষস ও পিশাচেরা যজ্ঞের বিঘ্ন করিত। দুর্গাপূজা দুর্গাযজ্ঞ, বোধনের সময় যজ্ঞ-বিঘ্নকারকদিগকে মন্ত্রিত শ্বেত সর্ষপ বিক্ষেপের দ্বারা অপসারিত করা হয়।

চণ্ডীমণ্ডপে বোধন হয় না। বোধনের নিমিত্ত সূত্রদ্বারা এক পৃথক বস্ত্রগৃহ নির্মিত হয়। (এক বেদীর চারি কোণে শর পুঁতিয়া কয়েকবার সূত্র বেষ্টন পূর্বক বস্ত্রগৃহ মনে করা হয়)। সেই বস্ত্রগৃহে যুগ্মফল-বিশিষ্ট বিল্বশাখা স্থাপিত হয়। বেদীতে অলক্তক, সূত্র ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিয়া দেখিলে এই বস্ত্রগৃহ সূতিকাগৃহ, যুগ্মফলের একটি মাতার কুক্ষি, অপরটি ভ্রূণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত্ত ছুরি। নাড়ীবন্ধনের নিমিত্ত সূত্র। অলক্তক শোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্বে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত ঘটস্থ দেবীর নিমিত্ত কেশসংস্কার দ্রব্য, অঙ্গরাগ দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ভ সম্ভাবনা না করিলে এসবের প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিল্বশাখা ও ফলে দেবীর বোধন অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিল্বশাখায় দুর্গারূপ অগ্নির আবির্ভাব। বিল্বফল দেবীর প্রতিরূপক। সূর্যোদয়ের পর অগ্নিমন্থন ও যজ্ঞ হইত, রাত্রি-কালে হইত না। অতএব সায়ংকালের বোধন অকালবোধন। সায়ংকালে কেন? কারণ রাত্রি সন্তানপ্রসবের কাল।

এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, দেবীকে ঘটে পূজা করিতেছি। তখন তাহাঁর বোধন হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত কেশসংস্কারাদি দ্রব্য কাহাকে প্রদত্ত হয়? কাহার জন্মের নিমিত্ত সূতিকাগৃহ নির্মিত হয়? দেবীর হইতে পারে না।

আদ্যা বিশ্বারণির জন্ম-কল্পনা করা যাইতে পারে না। আমার বোধ-হয়, দুইটি পৃথক ভাবনা মিশ্রিত হইয়াছে। একটি বিল্বশাখায় অগ্নি-উৎপাদন, অপরটি অন্যের জন্ম কল্পিত হয়। পরবর্তী প্রকরণে সে অন্যের অনুসন্ধান করা যাইবে।

আমি নবপত্রিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। নবপত্রিকা নবদুর্গা, ইহার দ্বারাও কিছুই বুঝিলাম না। দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই। ইহা কোন্ পুরাণে প্রথম পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। নবপত্রিকা দুর্গা পূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে। কোন্ দেশে কবে ইহার উৎপত্তি? বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মানুষের স্বভাব যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্যত্র প্রচারিত হয়। নবপত্রের মধ্যে জয়ন্তী একটা। জয়ন্তী কি গাছ? জয়ন্তী নাম সংস্কৃত। অগ্নিমন্থের নাম জয়ন্তী আছে। আমরা বঙ্গদেশে যে গাছকে জয়ন্তী বলি, সে আর এক জয়ন্তী। সে গাছই সংস্কৃত নামের জয়ন্তী, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। রঘুনন্দন ভবিষ্যপুরাণ হইতে নবপত্রিকার নয়টি গাছের নাম দিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের বচন কোন্ দেশের, কোন্ কালের তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য।

দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব

দুর্গাপূজা কবে? পূর্বে দেখিয়াছি, কেবল আশ্বিন শুক্লাষ্টমীতে, কিম্বা কেবল শুক্লনবমীতে পূজা করিতে পারা যায়। হেতু কি? ঘটে পূজা হইলেও পূজা সিদ্ধ হয়।

শরৎঋতু আরম্ভে পূজা করিতে হয়। দৈবক্রমে চান্দ্র আশ্বিন মাসে শরৎঋতুর আরম্ভ, কিন্তু পূজা আশ্বিনমাসীয়া নয়, শারদীয়া। খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে কৃষ্ণযজুর্বেদের কালে বসন্তাদি ছয় ঋতু ও প্রত্যেক ঋতুর দুই সমান ভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। যথা—মধু ও মাধব বসন্ত, ইষ ও উর্জ শরৎ, ইত্যাদি ঋতু-সম্বন্ধীয় ভাগ। এইসকল ভাগকে আর্তব মাস বলা যাইতে পারে। ইষ শরৎঋতুর প্রথম মাস। পূজার সংকল্পে ইষ মাস বলিতে হয়। আশ্বিন মাস অশ্বিনী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত আছে। অতএব সে মাস স্থির ও নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু ইষ মাস স্থির নাই। ঋতু পিছাইতেছে, ইষ মাসের আরম্ভেও পিছাইতেছে। বর্তমানে ভাদ্র মাসের ৮ই ইষ মাসের আরম্ভ হইতেছে।

দেখা গেল, সূর্যের ভোগ দেখিয়া পূজার দিন নিরূপিত হইয়াছে। সৌর মাসে নিরূপিত হইলে বর্ষে বর্ষে সৌর মাসের একই দিবসে পূজা হইত। চান্দ্র মাস ধরিয়া তিথির দ্বারা দিন গণিত হইতেছে। কিন্তু তিথি যথেষ্ট নয়। কেবল তিথি জানিলে কিম্বা চন্দ্রের নক্ষত্র জানিলে সূর্যের ভোগ জানিতে পারা যায় না। তিথি ও চন্দ্রের নক্ষত্র, এই দুই না পাইলে সূর্যের ভোগ জানিতে পারা যায় না। এই কারণে স্মৃতিকার তিথির সহিত নক্ষত্র দেখিতে বলিয়াছেন (পরিশিষ্ট পশ্য)।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিম.বৎসর আরম্ভ হয়। চান্দ্রমাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ আরম্ভ ধরা হইতেছে। ইহার আট মাস পরে এবং প্রতি মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎঋতুর আরম্ভ ধরিতে হইতেছে। এই কারণে সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য। মাঘ শুক্ল প্রতিপদের পূর্বতিথি পৌষ

অমাবস্যা। যদি সেদিন মধ্যরাত্রিতে অমাবস্যা পূর্ণ হয় এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আশ্বিন শুক্লাষ্টমীর মধ্যরাত্রে আট তিথি পূর্ণ হয়। মধ্যরাত্রে সন্ধিক্ষণের আরও মাহাত্ম্য।

এই আলোচনা দ্বারা শারদীয়া পূজা প্রচলনের পূর্বসীমা পাইতেছি। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার দিন গণনার নিমিত্ত এক পুস্তিকা ছিল। তাহার নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ইহা খ্রী-পূ ১৩৭২ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তিথি বৃদ্ধি এবং মাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ গৃহীত হইয়াছে। দুর্গাপূজা যজ্ঞক্রিয়াবিশেষ মনে করিলে উক্ত অব্দের পরে প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহার পূর্বে কবে হইত? দৈবক্রমে তাহার প্রমাণ আছে। আমরা জানি আশ্বিন অমাবস্যায় শ্যামাপূজা এবং প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা। পরদিন কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে দ্যূতক্রীড়া। এই দিন গুজরাটে বণিকেরা নূতন বৎসর আরম্ভ করে এবং নূতন খাতা খুলে। সে প্রদেশে এই দিন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। হেতু কি? তাহারা যজুর্বেদের ও অথর্ববেদের কালের শরৎ বৎসর গণনা করে। এই দুই বেদে মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই তিথির নাম একাষ্টকা ছিল। "একাষ্টকা সম্বৎসরের প্রথমা রাত্রি"। (রাত্রি দিবস)। সেদিন হইতে আট মাস আট তিথি গণিলে আশ্বিন অমাবস্যা আসে। পরদিন কার্ত্তিক শুক্লপ্রতিপদে শরৎ বৎসর আরম্ভ। দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। নূতন বৎসর কেমন যাইবে, তাহা জানিবার ইচ্ছা। এখন কোথাও ভাগ্য-পরীক্ষার এই বিধি প্রচলিত আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, সকলেরই ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখিবার কথা। অমাবস্যার প্রদোষে লক্ষ্মীপূজার বিধিরও সেই অভিপ্রায়। নববর্ষের পূর্বদিন লক্ষ্মীর প্রসাদ ও শ্যামার নিকট অভয় প্রার্থনা করা হয়। আশ্বিন শুক্লনবমীতে যেমন দুর্গাপূজা, আশ্বিন অমাবস্যায় তেমন শ্যামাপূজা। সে রাত্রের দীপালীর সহিত এই পূজার ও নববর্ষোৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। দীপালীর হেতু ভিন্ন। মহালয়ায় যেমন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দীপদান, আশ্বিন অমাবস্যাতেও তেমন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দীপদান করা হয়।

মাসপ্রতি একদিন বৃদ্ধি স্থূল গণনা। সূক্ষ্ম গণনায় আশ্বিন শুক্ল-

নবমীতে বর্ষাঋতুর শেষ হয়। দশমীতে শরৎঋতু ও শরৎ বৎসর আরম্ভ হয়। নবমী অন্তে রবির ভোগ ৫ রাশি পূর্ণ হয় (পরিশিষ্ট পশ্য)। ২৪১ শক=৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কালের গণনা চলিয়াছে। অতএব মনে হয়, ঐ শকের পূর্বে নয়দিন দুর্গাপূজা ও নবরাত্রিব্রত প্রচলিত ছিল না।

কিন্তু এতদ্‌দ্বারা সপ্তমীতে ও ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভের হেতু ও নবরাত্র, ব্রতের উৎপত্তি পাইতেছি না। বঙ্গদেশে আমরা প্রতিমায় পূজা করি, নবরাত্রব্রত ভুলিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ। নবরাত্র, নয় রাত্রি, নয় তিথির ব্রত। আশ্বিন শুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথির ব্রত। রাত্রি শব্দে তিথি বুঝায়। দশমী দশ-রাত্রি। ইহার সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোক "দশরা পরব" বলে, ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করে। ঘটের সম্মুখে নয় দিন চণ্ডীপাঠ হয়। দশমীতে ঘটের বিসর্জন।

আমাদের কোনও ব্রত বা পূজা বৎসরের যে-সে দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিন জ্যোতিষে বিশেষ দিন। সকল জাতিই এই বিধি অনুসরণ করে। ব্রতপালন ও দেবদেবীর পূজার দ্বারা আমরা সেদিন স্মরণ করি। কোন্ স্মরণীয় দিনের সহিত নব-রাত্রব্রত যুক্ত হইয়াছে? কিন্তু কোন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি নির্ণয় অতিশয় কঠিন। এখানে একটা উৎপত্তি উপন্যস্ত করিতেছি।

মাহেশ্বরযুগ নামে এক যুগ-গণনা প্রচলিত ছিল (পরিশিষ্ট পশ্য)। ২৪৭ সায়ন বৎসর ও ১ মাস এই যুগের পরিমাণ। প্রত্যেক যুগ শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। ইহা এই যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক শুক্ল সপ্তমীর এক নাম ছিল। কয়েকটি নাম মৎস্যপুরাণে আছে, কয়েকটি পাঁজিতে লিখিত হইতেছে। যেমন মিত্র সপ্তমী, রথ সপ্তমী। শুক্ল ষষ্ঠীতে যুগ সমাপ্ত হইত। শুক্ল ষষ্ঠীরও নাম ছিল। কয়েকটি নাম পাঁজিতে লিখিত হইতেছে। যেমন গুহষষ্ঠী, আরণ্য ষষ্ঠী। ইহা হইতে প্রতিমাসের শুক্ল সপ্তমী রবির এবং শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। যদি কোন যুগ আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হয়, পরবর্তী যুগ কার্ত্তিক শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। এই

ক্রমে পূর্বাপর যুগ গণনা চলিতে থাকে। এই কারণে এই যুগগণনা
কবে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমার অনুমান,
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর-বৎসর হইতে এই গণনার প্রচলন হইয়াছিল।
খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দের হেমন্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। পরবৎসর
খ্রী-পূ ১৪৪০ অব্দে প্রথম যুগ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়া
২৪৭ বৎসর একমাস পরে খ্রী-পূ ১১৯৩ অব্দের আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠীতে
পূর্ণ হইয়াছিল। এই ষষ্ঠীর নাম আদিকল্প ষষ্ঠী ছিল। পরদিন
সপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ, ইত্যাদিক্রমে যুগগণনা চলিয়াছিল।
প্রথম যুগে আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে রবির ভোগ ১৫০° অংশ
হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগে আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠীতে, তৃতীয় যুগে আশ্বিন
শুক্ল পঞ্চমীতে ইত্যাদিক্রমে সপ্তমযুগে খ্রী-পর ২৯১ অব্দে (২১৩
শকে) আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদে রবির ভোগ ১৫০° হইয়াছিল। আমার
বোধ হয়, শুক্ল অষ্টমী ও নবমীর সহিত এই সাতদিন যুক্ত হইয়া নবরাত্র
হইয়াছে। দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ খ্রী-পূ ১১৯৩ অব্দে এক বিশেষ
যোগ ঘটিয়াছিল। আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে রবির ভোগ ১৫০° অংশ পূর্ণ
হইয়া পরদিন সপ্তমীতে নবযুগ ও নব শরৎ বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল।
এমন যোগ দুর্লভ। যুগচক্র একবার ঘুরিয়া না আসিলে আর ঘটে না।
খ্রী-পর ২৯১ অব্দে সপ্তম যুগে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদে রবির ভোগ
১৫০° হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় এই অব্দের পরে ও অষ্টম
যুগের পূর্বে নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার সহিত পূর্বো-
ল্লিখিত খ্রী-পর ৩১৯ অব্দের ঐক্য হইতেছে। এই অনুমানের এক
প্রমাণ দিতেছি। কালিকা-পুরাণ লিখিয়াছেন, আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দশীতে
দশভুজা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেদিন শরৎঋতুর আরম্ভ
হইয়াছিল। কালিকা-পুরাণের মাস পূর্ণিমান্ত। আমরা যে অমান্ত
মাস গণি, তদনুসারে ইহার নাম ভাদ্রকৃষ্ণ চতুর্দশী হয়। ৭৮৫
খ্রীষ্টাব্দে সে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কালিকা-পুরাণে উহার পরের
তিথি নাই। অতএব মনে হয় কালিকা-পুরাণ অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দ
হইতে একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

উক্ত যুগগণনায় খ্রী-পূ ১১৯৩ অব্দের যুগে আশ্বিন-শুক্ল ষষ্ঠীর

নাম আদিকল্পষষ্ঠী ছিল। বোধ হয় ইহাকেই আমরা ষষ্ঠ্যাদি কল্প বলিতেছি। ষষ্ঠীতে বোধন সংগত হইতেছে। পরদিন শুক্ল সপ্তমীতে নূতন যুগের সহিত নব বর্ষের রবির উদয় হইয়াছিল। ষষ্ঠীর রাত্রে এই রবির বোধন হয়। উদয়ের নাম জন্ম, বেদে প্রসিদ্ধ আছে। সপ্তমী রবির তিথি। রবির নিকট পশুবলি নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এই কারণে দুর্গাপ্রতিমা পূজাতেও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোথাও কোথাও সপ্তমীতেও পশুবলি হয়, সে-টা অশাস্ত্রীয়।

রঘুনন্দন দেবীপুরাণের প্রমাণে ভাদ্রকৃষ্ণনবমীতেও কল্পান্তর লিখিয়াছেন। দেবীপুরাণের মাস পূর্ণিমান্ত। তদনুসারে আমরা যাহা ভাদ্রকৃষ্ণনবমী বলিতেছি, তাহা আশ্বিনকৃষ্ণনবমী। এই আশ্বিনকৃষ্ণ-নবমী হইতে আশ্বিনশুক্লনবমী পর্যন্ত ১৬ দিন পূজা হয়।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের "প্রবাসী"তে বন্ধুবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছিলেন, ছত্রিশগড় অঞ্চলে গ্রামের কুমারীরা "কুমারী ওষা" (কুমারীর উপবাস) নামক ব্রত করে। ভাদ্রকৃষ্ণঅষ্টমীতে আরম্ভ ও আশ্বিনশুক্লনবমীতে শেষ। এই ১৭ দিন তাহারা একবেলা ভোজন করে, কুমারী দেবীর পূজা করে। পাড়ায় পাড়ায় বাজনা বাজে, নিম্নশ্রেণীর নারীরা নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়। শেষদিন বেহায়া বর্ষীয়সী নারী অশ্লীল গান গাহিয়া থাকে। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন; "কুমারী ওষার কুমারীরা পূর্বে অনার্য ছিল। এখন আর্যসমাজভুক্ত হইয়াছে।" তাহারা আর্য হউক, অনার্য হউক ১৭ দিন পূজার সমর্থন পাইতেছি।

পূর্ণিমান্ত আশ্বিন, অমান্ত ভাদ্রকৃষ্ণনবমীতে পূজার হেতু বুঝিতে কষ্ট নাই। রবির উত্তরায়ণ হইতে হিমবৎসর আরম্ভ। আমরা অমান্ত চান্দ্রমাস গণি। তদনুসারে পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ। পরদিন, মাঘ শুক্ল প্রতিপদ হইতে নূতন বৎসর। কিন্তু পূর্ণিমান্ত মাস গণিলে পৌষ পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ, এবং পরদিন মাঘ কৃষ্ণপ্রতিপদে হিম.বৎসর আরম্ভ হইবে। অবশ্য একই বৎসরের পৌষ পূর্ণিমায় ও পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ হইতে পারে না। একের চারি বৎসর পরে অপরটি হয়। পৌষ পূর্ণিমা হইতে ৮ মাস ৮ তিথি গণিলে ভাদ্রকৃষ্ণ নবমীতে

শরৎঋতুর আরম্ভ হয়। সেদিন দেবীপূজা সমাপ্ত হইবার কথা (পরিশিষ্ট পশ্য)। সেদিন বোধন ও পূজার আরম্ভ হইবার হেতু পাই না, নবরাত্র ব্রতও পাই না। পূজার এত কল্প কদাপি একদেশে কিম্বা এককালে আসে নাই। একের সহিত অন্যের স্বাভাবিক যোগও নাই। ফলে দুর্গাপূজাপদ্ধতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাপূজার সংকল্পে দেখিতেছি, কেহ অতুল বিভূতি, কেহ সম্বৎসর সুখপ্রাপ্তি, কেহ দুর্গাপ্রীতিকামনায় বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গামহা-পূজা করেন। রাজা প্রথমটি, প্রজা দ্বিতীয়টি এবং ভক্ত তৃতীয়টির কামনা করেন। সম্বৎসর সুখপ্রাপ্তি, অর্থাৎ দুর্গাপূজা হইতে সম্বৎসর আরম্ভ। "বৃহদ্ধর্মপুরাণে" আশ্বিনাদি মতাঃ মাসাঃ, আশ্বিন হইতে বৎসরের মাস গণনা হইয়াছে। বিজয়া দশমী হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। এই পুরাণ রঘুনন্দনের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছিল।

সকল জাতিই নববর্ষের আরম্ভে উৎসব করিয়া থাকে। গৃহ মার্জিত ও সজ্জিত হয়, সকলে নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হয়, সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে, নূতন বৎসরে সুখ-সৌভাগ্য ও বিজয় কামনা করে। পূজা-প্রাঙ্গণে মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়, মণ্ডপের চারি দিকে বনমালা লম্বিত হয়, তোরণ নির্মিত হয়, ধ্বজা উত্তোলিত হয়, নানাবিধ বাদিত্র উৎসব ঘোষণা করিতে থাকে। গ্রামে কাহারও বাড়ীতে দেবীর পূজা হইলে, গ্রামস্থ সকলে মনে করে তাহাদেরও মঙ্গল হইবে। যিনি পূজা করেন, তিনি গ্রামস্থ সকলকে উৎসবে আহ্বান করেন। সকলেই হৃষ্টচিত্তে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। (কয়েক বৎসর হইতে কালধর্মে এই ভাব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে)।

গুজরাট ও কাঠিবাড় প্রদেশে নবরাত্রের সময় নারীরা "গর্বা" নৃত্য করে। এক শতচ্ছিদ্র শ্বেতরঞ্জিত হাঁড়ির ভিতরে প্রজ্বলিত দীপ রাখে এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া মঙ্গলাকারে নৃত্য করিতে করিতে গান গায়। এই নৃত্য ও গীতের নাম গর্বা। শব্দটি গর্ভ (ভ্রূণ) তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঁড়ির শতচ্ছিদ্র পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে, যেন সূর্য।

নববর্ষের সূর্যই গর্ভ। নবরাত্রের অন্তে নববর্ষের সহিত নবসূর্য উদিত হইবে, এই আহ্লাদে নৃত্যগীত করে। বিবাহাদি উৎসবেও গর্বা-নৃত্য হয়। বোধ হয় সেখানেও গর্ভসম্ভাবনা কল্পিত হয়।

নদীর স্রোতে প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল ও কর্দম-ক্রীড়া। সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গান হইত। ইহা দুর্গোৎ-সবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইত না। উত্তর-ভারতে হোলি খেলায় এইরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। দোলযাত্রায় আমরা পূর্বকালের হিম বর্ষারম্ভের স্মৃতি পালন করিতেছি। সে দিন মহারাষ্ট্র দেশে কোন কোন ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ স্পর্শ-পূর্বক দেহ অশুচি করেন, অভিপ্রায় একই। নববর্ষ প্রবেশহেতু সেই কারণে শবরোৎসবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শবরজাতির বাস ছিল। বোধ হয় তাহাদের রাজা নবরাত্র করিতেন। তাহাঁর শবরজাতীয় প্রজা ঘট বিসর্জনের পর জলকাদা লইয়া খেলা করিত। নববর্ষারম্ভে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক। এই আচার দুর্গাপূজা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু ক্রীড়াকৌতুক এক কথা, আর 'ক্ষেউড়' আর এক কথা। ছত্রিশগড় অঞ্চলে কুমারী ওষা নামক ব্রতের সমাপ্তি দিনেও নির্লজ্জা নারী অশ্লীল গান গাহিয়া বেড়ায়। কৃষ্ণযজুর্বেদে আছে, সম্বৎসরব্যাপী সত্রের পর ঋত্বিকেরা হর্ষ-ক্রীড়া করিতেন, আর তাহাঁদের সম্মুখে দাসজাতীয়া বারাঙ্গনা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য ও অশ্লীল গীত করিত। আমার বোধ হয় লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন অশ্লীল ভাষা শুনিলে দেহ অশুচি হয়, যমরাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন না।

দশরা দিনে দেশীয় রাজ্যে মহাসমারোহে নীরাজনা হয়। দশমীর পূর্ব হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কৃত ও তৈল-মার্জিত হয়। সেদিন অশ্ব-গজের গাত্র ধৌত ও অলঙ্কৃত হয়। রাজপুরোহিত অশ্ব-গজ ও অস্ত্রের পূজা করেন। অপরাহ্নে রাজা সুবেশে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। অমাত্য, সামন্ত ও উচ্চপদস্থ পাত্রমিত্র স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অন্যান্য হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন। পদাতিক ও অশ্বারোহী রণবেশে প্রাসাদের বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকে। রাজা দেবী

প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। দামামা বাজিতে আরম্ভ হয়। পথের জনাকীর্ণ দুই পার্শ্বের মধ্য দিয়া রাজা সদলবলে যাত্রা করেন। কিছু দূরস্থিত মন্দিরে দেবীকে প্রণাম করেন এবং শমীপত্র লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। সেদিন যাত্রা করিলে সম্বৎসর বিজয় হয়। এই উৎসবের নাম দশরা।

পূর্বের আলোচনা হইতে মনে হয়, তৃতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দের পরে নবরাত্র ও দশরা আসিয়াছে। তৎপূর্বে উত্তর-ভারতের কোথাও কোথাও মহিষ-মর্দিনীর পাষাণ প্রতিমা নির্মিত ও পূজিত হইত। মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মহিষমর্দিনী কল্পনার বিস্তার হইয়াছিল। চামুণ্ডা মহীশূর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও মহারাজার কুলদেবী। মৎস্যপুরাণে মহিষমর্দিনী-দশভূজা প্রতিমা লক্ষণ আছে, অন্য পুরাণে নাই। মৎস্যপুরাণ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রচিত মনে হয়, পরবর্তী প্রকরণে প্রমাণ দেওয়া যাইবে। সেখান হইতে কামরূপে কালিকাপুরাণে দুর্গাপূজা বিস্তৃত হইয়াছিল। এই পুরাণ বঙ্গের দুর্গাপূজার আদি। এই অনুমান সত্য হইলে দশম খ্রীষ্ট শতাব্দের পরে বঙ্গদেশে দুর্গা-পূজা প্রচারিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের দুর্গাপূজা-বিষয়ক নিবন্ধও পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, রাজা সুরথ দুর্গার মৃন্ময়মূর্তি পূজা করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজা সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন। দেবী-ভাগবত অন্য রাজারও নাম করিয়াছেন। এইরূপ দেবীর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত কালিকাপুরাণ লিখিয়াছেন, ত্রেতাযুগে রাবণ বধের নিমিত্ত রামচন্দ্রের হিতার্থে ব্রহ্মা দেবীপূজা করিয়াছিলেন। আরও আছে, রাবণ বসন্তকালে দেবীপূজা করিত। এইসকল উপাখ্যানের হেতু পাওয়া যায় না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত সুরথ রাজার উপাখ্যানে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

মনু এক কাল-সংখ্যা। এক মনু-কাল ২৮৪ বৎসর (পরিশিষ্ট পশ্য)। এই গণনার আদি হইতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মনু ইত্যাদি না বলিয়া এক এক নাম হইয়াছিল। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি

না বলিয়া যেমন অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে, তেমন মনু গণনাতেও আছে। আমরা শুনিয়া আসিতেছি বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতিতম যুগের দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সে কোন্ বৎসর? আমার মতে খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দ। তখন বৈবস্বত মনুকাল চলিতেছিল। পরে সাবর্ণি মনু আসিয়াছিলেন। খ্রী-পূ ১২৬৮ অব্দে সাবর্ণি মনুর আরম্ভ এবং ৯৮৪ অব্দে শেষ। পুরাণ মানিলে এই দুই অব্দের মধ্যে সুরথ রাজা ছিলেন। রাজা অবশ্য মনু হন নাই। মনু-নামগুলি সংজ্ঞা মাত্র। বুঝিতে হইবে, রাজা সুরথ সাবর্ণি-মনুকালে ছিলেন।

ইহার সহিত পূর্ববর্ণিত মাহেশ্বর যুগ স্মরণ করিতে হইবে। দেখিয়াছি, খ্রী-পূ ১১৯৩ অব্দে মাহেশ্বর যুগ আশ্বিন শুক্ল-ষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা সপ্তমীতে দুর্গাপ্রতিমায় পূজা হইবার হেতু মনে হয়। দেখা যাইতেছে, দ্বিবিধ গণনাতে খ্রী-পূ দ্বাদশ শতাব্দ আসিতেছে। ইহা আকস্মিকও হইতে পারে।

সুরথ কোল দেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুরে বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বাঞ্চলে এখনও কোল জাতির বাস আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নাগপুর প্রদেশে পঞ্চম খ্রীষ্ট-শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। বোধ হয় সে দেশে দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মিত হইত। অদ্যাপি জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দীভাষীর মধ্যে দেবী-প্রতিমায় দুর্গাপূজা চলিতেছে। এই পুরাণ কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া সুরথ রাজার উপাখ্যান লিখিয়া থাকিবেন।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণ-মতে আর এক কল্পে বৈবস্বত মনুর পর সাবর্ণি মনুকালে মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে বৈবস্বত মনুর জন্মবৃত্তান্ত আছে। বিবস্বান্ অম্বুবাচী দিনের সূর্য। এই সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু। সব কথা দেবলোকের। মহিষাসুর-বধও দেব-লোকে হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বৈবস্বত মনু, যম ও সাবর্ণি মনুর জন্মবৃত্তান্ত উপাখ্যান আকারে লিখিত হইয়াছে। অতএব সেকালের সহিত সুরথ রাজার কালের বিরোধ নাই। পাঠকের

কৌতূহল নিবারণার্থে উপাখ্যানের অর্থ করা গিয়াছে। যে অর্থই করি মনে রাখিতে হইবে, আখ্যান নয়, উপাখ্যান। খ্রী-পূ দশম শতাব্দে দুর্গার কিম্বা অন্য দেবদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণের অন্য কোন প্রমাণ নাই।

দুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল

দুর্গোৎসবের প্রমাণ কি? কে দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছেন? যিনি বলিয়াছেন, তিনি প্রমাণ। যে পদ্ধতিতে দুর্গোৎসব হইতেছে, কে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন? যিনি করিয়াছেন, তিনি প্রমাণ। একজনে করেন নাই, বহুজনে করিয়াছেন, বহুজন প্রমাণ। যে পুরাণে লিখিত আছে, সে পুরাণ প্রমাণ। কোন্ পুরাণ মান্য, কোন্ পুরাণ নয়, তাহা স্মৃতির ব্যবস্থাপকের বিচার্য। প্রসিদ্ধি এই, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি পুরাণের বীজ দিয়াছিলেন। তাহাঁর শিষ্য-পরম্পরা অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিতে পারে না। উপ-পুরাণ ব্যাস-সম্প্রদায়ের বহির্ভূত অন্যের রচিত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কতকগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ প্রধান। যে পুরাণই হউক, তাহার রচনার দেশ ও কাল না জানিলে দুর্গোৎসবের ইতিহাস সঙ্কলনের সাহায্য হয় না।

আমি এইখানে কয়েকটি পুরাণের রচনার দেশ-ও কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলা বাহুল্য, এই কর্ম অতিশয় কঠিন। যদি বা পুরাণ-রচনার দেশ অনুমান করিতে পারা যায়, পুরাণ-রচনার কাল অনুমান দুঃসাধ্য। কারণ পুরাণ পুরাবৃত্ত, ইহাতে স্বসময়ের বৃত্তান্ত থাকে না, পূর্বকালের বৃত্তান্ত থাকে। আর এক বিঘ্ন আছে। জনপ্রিয় গ্রন্থে নূতন নূতন বিষয় যোজিত হয়। শ্লোক, অধ্যায়, সন্দর্ভযোগ হেতু পুরাতনের সহিত নূতন মিশ্রিত হইয়া যায়।

পুরাণকর্তাকে কবি বলা যাউক। তিনি পুরাবৃত্ত রচনা করিলেও কদাপি স্বদেশ ভুলিতে পারেন না। দেখিতে হইবে, কবি কোন্ দেব বা দেবীর, কোন্ তীর্থের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কোন্

কোন্ বৃক্ষ তাহাঁর স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। সকল বৃক্ষ সকল দেশে জন্মে না। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সে সে বৃক্ষ পুরাণের দেশের না কবির স্মৃতি। পুরাণ পুরাবৃত্ত বটে, কিন্তু কবি স্বসময়ের ও স্বদেশের আচার-ব্যবহার বর্জন করিতে পারেন না।

কাল-অনুমানের নিমিত্ত এরূপ সাহায্য অত্যল্প পাওয়া যায়। অমুক দেশে অমুক শতাব্দে এই আচার ছিল কিম্বা পূর্বে ছিল না, পরেও ছিল না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই পুরাণ জ্ঞাতকাল অমুক গ্রন্থের কিম্বা পুরুষের পূর্বে কিম্বা পরে, এই সঙ্কেত ধরিতে হয়। বহু পুরাণ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে তাহার কাল-অনুমানের প্রজ্ঞা জন্মে। ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ না হইলে পুরাণসকল কালানুসারে সাজাইতে পারা যাইত। মরাঠী ভাষায় শ্রী ত্র্যম্বক-গুরুনাথ কালে "পুরাণ নিরীক্ষণ" লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও কয়েকখানি উপপুরাণের রচনার কাল অনুমান করিয়াছেন। আমি অতি অল্প পুরাণ দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে কালে মহাশয়ের মত গ্রাহ্য মনে হইতেছে। ভবিষ্যপুরাণ ও নন্দিকেশ্বরপুরাণ দেখিতে পাইলাম না। দেবী-ভাগবত বহু জনের আদৃত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ রঘুনন্দনের পূর্বে রাঢ়ে প্রণীত। এই দুই পুরাণেরও দেশ ও কাল চিন্তা করা যাইবে।

মৎস্যপুরাণ

মৎস্যপুরাণ মহাপুরাণ। মহাভারতে (বনপর্বে) বায়ু-ও মৎস্য-পুরাণের নাম আছে। মহাভারতের বর্তমান আকার খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরে কোথাও কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা নগণ্য। অতএব মৎস্যপুরাণ প্রাচীন বলিতে হইবে। কিন্তু মৎস্যপুরাণের বর্তমান আকার কোনও এক সময়ে আসে নাই। ইহাতে বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ বিষয় কবে যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই।

মৎস্যপুরাণ মহাভারত হইতে অনেক উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতোক্ত উপাখ্যানে নূতন রূপ প্রদত্ত হইয়াছে। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। মহাভারতে তারকাসুর-বধের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত যেরূপ আছে, মৎস্যপুরাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চৈত্র মাসের অমাবস্যায় পার্বতীর কুক্ষি ভেদ করিয়া কুমার ষড়ানন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভারতের মতে কার্ত্তিক অমাবস্যায় শরবনে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে কার্ত্তিকেয় পার্বতীর পুত্র। মহাভারতে পার্বতী উমার নামও নাই। মৎস্যপুরাণ কুমারসম্ভব নামে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস তাহা অনুসরণ করিয়াছেন।

মৎস্যরূপী ভগবান্ মৎস্যপুরাণের বক্তা, বৈবস্বত মনু শ্রোতা। অতএব মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণবপুরাণ হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শৈবপুরাণ। ইহাতে বিষ্ণুর পাঁচ দিব্য অবতার বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর প্রাধান্য ও আরাধনা নাই। প্রতিমা-লক্ষণে উমা-মহেশ্বরের প্রতিমা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুর হয় নাই। শুক্ল সপ্তমীতে বহুবিধ ব্রত করিতে বলা হইয়াছেন। এইসকল ব্রতে দিবাকরের আরাধনা প্রথিত হইয়াছে। এইসকল ব্রত ও বহুবিধ দানের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, কোন স্থানের পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজমানের অর্থ দোহন করিতে মৎস্যপুরাণে এই সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ পুরাণের দেশ ও কাল অনুমান দুঃসাধ্য।

তথাপি মনে হয় মৎস্যপুরাণ দক্ষিণ-ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে লিখিত শ্রাদ্ধকল্প প্রাচীন। লিখিত আছে, শ্রাদ্ধে দ্রবিড় ও কোকন ব্রাহ্মণ বর্জন করিবে (১৬)। কোকন কোঙ্কন, বোম্বাই নগর হইতে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত পশ্চিম সাগরের উপকূল ভাগ। ইহার দক্ষিণে কেরল দেশ; বর্তমান নাম মালাবার। কেরল দেশের পূর্বে দ্রাবিড়। শ্রাদ্ধে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ও কোঙ্কন ব্রাহ্মণ বর্জনীয় হইয়াছে। অতএব মনে হয় মৎস্যপুরাণ কেরল দেশে প্রণীত হইয়াছিল। কোচিন রাজ্যে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের বাস আছে। শুনিয়াছি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিম্বদন্তী এই, তাহাঁদের পূর্বপুরুষ বহু-কাল পূর্বে উত্তর-ভারত হইতে সে দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাহাঁদের দেহে ও বর্ণে এখনও বৈদিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। শৈব ও শাক্তের বিরোধ নাই। তথাপি দ্রাবিড় দেশ শৈব দেশ, মহীশূর হইতে পশ্চিম-সমুদ্র ও কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শাক্ত দেশ বলা যাইতে পারে। কেরলে গ্রামে গ্রামে কালীপূজা হইতেছে। নূতন হইতে পারে না। দ্রাবিড় পণ্ডিতেরা মনে করেন, তাহাঁদের দেশ শিবপূজার আদি-স্থান।

মৎস্যপুরাণে দুই তিন স্থানে আছে, উমা বিশ্বের অরণি (জনক-জননী)। তিনি নীলোৎপলবর্ণা ছিলেন। তপস্যা করিয়া তিনি গৌরবর্ণা হইয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ এই উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাঁর কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ হইতে কৌশিকী মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌশিকী কালীমূর্তি। লিখিত আছে, এই কৌশিকী মূর্তি বিন্ধ্যা-চলে প্রসিদ্ধ। বোধ হয় এই কৌশিকী দেবী বিন্ধ্যাচলে বহু পুরাতন এবং ইনিই বিন্ধ্যবাসিনী। (বিন্ধ্যাচল ই. আই. রেল ষ্টেশন)। সেখানে এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বস্ত্রাবৃত থাকে, কেহ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ অষ্টভুজা ভদ্রকালী, যিনি যশোদার কন্যা হইয়া-ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইহাঁকে বিন্ধ্যাচলবাসিনী লিখিয়াছেন (৯১।৩৮)। মৎস্যপুরাণে দেউলের গোপুর (বহির্দ্বার) আছে। গোপুর দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধ। একস্থানে দেউলে দেবদাসীর উল্লেখ আছে, ইহাও দক্ষিণ-ভারতের। এক স্থানে অন্যান্য ফলের সহিত তাল, নারিকেল, ও শমীর উল্লেখ আছে। তাল নারিকেল পূর্ব দিকেও আছে, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব দিকে শমী নাই, শমী পশ্চিম দিকে আছে। এইসব কারণে মনে হয় মৎস্যপুরাণ কেরল দেশে রচিত হইয়াছিল। এই দেশ উত্তর-ভারত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। উত্তর-ভারতের প্রচলিত উপাখ্যান, বহুদূরস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালান্তরও বিস্তর হইয়া থাকিবে।

মৎস্যপুরাণে নানা ঋষিবংশ ও রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে। সেসকল বংশের বর্ণনাদ্বারা মৎস্যপুরাণের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে। নারদপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের সূচী আছে। আমি নারদপুরাণ দেখি নাই। শ্রীযুত কালে মনে করেন, বর্তমান নারদপুরাণের পুরাণসূচী

ষষ্ঠ খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে বর্তমান মৎস্যপুরাণের কয়েকটি বিষয় ও ভবিষ্যৎ রাজবংশের বর্ণনা আছে। অতএব মৎস্য-পুরাণ পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে বর্তমান আকারে বিদ্যমান ছিল। মৎস্য-পুরাণে প্রতিমা-লক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায় চতুর্থ খ্রীষ্ট শতাব্দের মনে হইতেছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ

আমরা যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত। নারদপুরাণ-সূচী অনুসারে মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় সহস্র শ্লোক ছিল। বর্তমান বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পুরাণে ৬৩০০ শ্লোক আছে। অবশিষ্ট ২৭০০ শ্লোকের অভাব পড়িতেছে। সেসব শ্লোকে কি ছিল তাহা নারদসূচী হইতে জানিতে পারা যায়। বর্তমান পুরাণের নরিষ্যন্ত চরিতের পর রামচন্দ্রের কথা, কুশবংশ, সোমবংশ, পুরূরবা, নহুষ, যযাতি, যদুবংশ, শ্রীকৃষ্ণবালচরিত, মাথুরচরিত, দ্বারকাচরিত, সর্বাবতার কথা ছিল। মনে হয় যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া পুরাণের বৈষ্ণব অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তথাপি চতুর্থ অধ্যায়ে কবির বিষ্ণুপ্রীতি ও বাসুদেব-ভক্তি প্রকটিত আছে, কৃষ্ণের মাথুর মূর্তির উল্লেখও আছে। ইহা বৈষ্ণবপুরাণ কি শাক্তপুরাণ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সূর্যেরও এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণ সৌর কিনা তাহাও তর্কের বিষয় হইতে পারে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অনেক উপাখ্যান আছে। সেসব উপাখ্যান অন্য পুরাণে পাওয়া যায় না। উপাখ্যান মনোহর ও হিতোপদেশপূর্ণ। চতুর্দশ মনুর উৎপত্তি—বিশেষতঃ অষ্টম মনু সাবর্ণি মনুর উৎপত্তি অন্য পুরাণে নাই। সাবর্ণি মনু সম্পর্কে চণ্ডীমাহাত্ম্য আসিয়াছে। নারদসূচীতে উল্লেখ আছে। বোধ হয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ মৎস্যপুরাণ হইতে শুম্ভনিশুম্ভ, মধুকৈটভ ও মহিষাসুর লইয়াছেন। মহাভারত হইতে বৃক্ষ পর্যন্ত লইয়াছেন। বলরাম রৈবতক বনে নানাবৃক্ষ দেখিলেন (৬।১২-১৭)। যথা, আম্র, আম্রাতক, (আমড়া), ভব্য (চালতা), নারিকেল, তিন্দুক (গাব)। "আবিল্বকান্ স্তথাজীরান্ দাড়িমান্

বীজপুরকান্।" ইত্যাদি মহাভারত বনপর্ব (যক্ষযুদ্ধপর্ব) হইতে গৃহীত।*

মার্কণ্ডেয়পুরাণ-রচনার দেশ-নির্ণয় সহজ। ইহা বিন্ধ্য পর্বতে নর্মদা নদীর নিকটে (৪২।২)। সে দেশে অতিশয় গ্রীষ্ম। সে দেশে করম্ভ-বালুকা (বালুকার সহিত অল্প কর্দম মিশ্রিত করিয়া নির্মিত) কুম্ভমধ্যস্থ শীতল সমীরণ সুখসেব্য হইত (১৩।৫)। বোধ হয় বালুকা মাটির কলসীতে জল রাখিয়া তাহার উপরিস্থ বায়ু বায়ুপ্রেরক যন্ত্রদ্বারা ধনাঢ্য ও সুখী ব্যক্তির দেহে প্রেরিত হইত। (আমি কটকে এক মোহন্তের দুই হাত ব্যাসের তাম্র-নির্মিত বায়ু-প্রেরক দেখিয়াছি। বোধ হয় ভিতরে পাখা আছে, বাহিরে একজন ঘুরায়)। তালবৃন্ত, অনিল-স্থান, চন্দন, উশীর (বেনামূল, খস্‌খস্‌) অপহরণ করিলে নরকভোগ হইত (১৪।১৮)। ঘটিযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (১১।১৬)। ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্‌গ ও তিল প্রভৃতির সহিত অতসীর চাষ হইত (১৫।১৮)। সে দেশে ক্ষৌম, দুকূল, কার্পাস, বিশেষতঃ কৌশেয় ও পত্রোর্ণ পাওয়া যাইত।

এই কয়েক লক্ষণ যথেষ্ট। 'মধ্যপ্রদেশ' এই নামে দেশ বুঝিতে পারা যায় না। নাগপুর প্রদেশ বলিব। এই প্রদেশের অনেক বিশেষত্ব আছে। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্র একপ্রকার আচার-ব্যবহার, একপ্রকার সংস্কৃতি, একপ্রকার ভাষা। নাগপুর প্রদেশে এই তিন বিষয়ে ঐক্য নাই। সে প্রদেশে হিন্দী ও মরাঠী, দুই ভাষা। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নামের কোন অর্থ নাই। ব্রাহ্মণ ও কুর্মী নিরামিষাশী, অন্য সকলে আমিষাশী। পূজা বলিতে এক গণেশ-পূজা আছে, অন্য পূজা নাই, পরব আছে। নবরাত্রে পূজা নাই, ইহা এক পরব। নবরাত্র

---

*মহাভারতে এইসকল বৃক্ষ গন্ধমাদন পর্বতে ছিল, মার্কণ্ডেয়পুরাণের কবি রৈবতক বনে আনিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্বত, বর্তমান নাম করকোরম। এইসকল বৃক্ষ সেখানে অসম্ভব। 'তথা জীরান্' স্থানে মহাভারতের পাঠে অঞ্জীরান্ আছে, বিদ্বৎসমাজে তর্ক উঠিয়াছে। অঞ্জীর নাম ফার্সী, অর্থ সিরিয়া দেশের মধুর বড় ডুমুর। মহাভারতে ঐ নাম থাকা অতীব বিস্ময়কর।—মার্কণ্ডেয়পুরাণের পাঠ জীর.। এই জীর. বন্য ফল-তরু; জীরক (জীরা) নামক শাক নহে। জীর. কেমন তরু তাহা অজ্ঞাত।

কৃষকদের পরব। তাহারা নবরাত্রের পরের দিন গোধূম বপন করে। শারদীয়া পূজার সময় পনর দিন "রামলীলা" নামক যাত্রাগান হয়। জব্বলপুর নগরে মহিষমর্দিনী ও কালীর পাষাণ প্রতিমা আছে। বর্ষে বর্ষে শরৎকালে মহিষমর্দিনী দুর্গা ও কালীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মিত ও পূজিত হয়। এইরূপ পূজা গ্রামেও প্রচলিত আছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এক বিজ্ঞ বহুতীর্থদর্শী আমায় বলিয়াছেন, তিনি গত দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে জব্বলপুর নগর হইতে টোঙগায় আরোহী হইয়া তের মাইল দূরে শ্বেত পাহাড় দেখিতে যাইতেছিলেন। পাঁচ মাইলের পর গ্রামপথে চারি-পাঁচখানি মৃন্ময়ী সিংহবাহিনী দশভুজার পূজা দেখিয়াছিলেন। অতএব বোধ হইতেছে এককালে জব্বলপুরের দিকে শক্তিপূজা ও তান্ত্রিক পূজা বহু প্রচলিত ছিল। জব্বলপুরে ষোড়শ যোগিনীর মন্দির আছে। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ভৈরবীর পূজা হয়। জব্বলপুর নগর হইতে নর্মদা ছয় মাইল দক্ষিণে। এইখানে পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জব্বলপুরের দিকে গোধূমের চাষ হয়, কূপ হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন হয়। কেহ কেহ ঘটিযন্ত্রদ্বারা জল তোলে। অন্য উপায়ও আছে। কবি কামরূপ গিয়াছিলেন। সেখানে "সিদ্ধক্ষেত্রে" ভাস্করের মন্দির দেখিয়াছিলেন (১০৯।৩৯)। বিজয়নগর দেখিয়াছিলেন (৬৬।৮)। 'ময়নামতীর গানের' ও 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিজয়নগর। কদলীরাজ্য আসামে। তিনি সিদ্ধক্ষেত্রে কেন গিয়াছিলেন? তান্ত্রিক মন্ত্র শিখিতে? তিনি উচ্চাটন মন্ত্র (৭০।২২) আভিচারিক ক্রিয়া (১১৭) ও তান্ত্রিক যোগের (৩৯) উল্লেখ করিয়াছেন।

নাগপুরে প্রখর গ্রীষ্ম। ভারতের আর কোথাও তত গ্রীষ্ম হয় না। বিশেষতঃ জলের অভাবে লোকের আরও কষ্ট হয়। নদীকূলে বালিয়া মাটিতে তালগাছ আছে, কিন্তু অল্প। সেখানে তালবৃন্ত হয় না, অন্য-স্থান হইতে অল্প আসে। বাঁশের সরু চাঁচের পাখা অধিক প্রচলিত। সুখী ও ধনী লোকে খস্‌খসের পর্দা জলসিক্ত করিয়া গৃহের দ্বারে ঝুলাইয়া দেয়। বোধ হয় পুরাণের কালেও এই উপায় করিত। পুরাণে নাগকুলের অনেক বর্ণনা আছে। নাগেরা মানুষ, সর্প নহে। সেই

নাম হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে। পুরাণের কালে অতসীর চাষ হইত, অংশু দ্বারা ক্ষৌম ও দুকূল নির্মিত হইত। এই দুই বস্ত্র চারি শত বৎসর অজ্ঞাত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে নাগপুর প্রদেশে ক্ষুমার নিমিত্ত অতসীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। নাগপুর প্রদেশে কৌশেয় (তসর) উৎপন্ন হয়, কিন্তু পত্রোর্ণ (সাদা তসর) হয় কিনা, সন্দেহ। গঙ্গা ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ছোটনাগপুরে—যেমন চাইবাসায়, তসরের উৎপত্তি।*

এই পুরাণে অগ্নিশুচি বস্ত্রের উল্লেখ আছে (৮৫।৫২), যে বস্ত্র অগ্নিদ্বারা শুদ্ধ হয়। সে কি বস্ত্র যাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না? অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্র একটি আছে। ইংরেজী নাম Asbestos। মিশর দেশের পুরোহিতেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন। বোধ হয় সেই দেশ হইতে মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেশে আসিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে আছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল নামক নিশাচর প্রসিদ্ধ হইয়াছিল (৭১)। ফলজ্যোতিষ (৭২), মেষাদি রাশি (৫৮) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বালকৃষ্ণচরিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল মনে হয়।

দেবীপুরাণ

দেবীপুরাণ উপপুরাণ। ইহাতে দেবীর পূজাবিধি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কথা প্রায় নাই। পুরাণের প্রথম কয়েক পাতা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, এক রাজগুরু রাজাকে উপদেশ দিবার

---

* নাগপুর প্রদেশের রাইপুরের কার্যান্তক ইঞ্জিনীয়র রায় সাহেব শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের নিকট হইতে নাগপুর প্রদেশের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। ইঞ্জিনীয়রকে নানা স্থানে ঘুরিতে হয়, চোখ কান খুলিয়া রাখিতে হয়। এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনীয়র রায় সাহেব শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস-দর্শনে গিয়াছিলেন। হিমাবৃত মানস সরোবরে স্নান ও রজতোজ্জ্বল কৈলাসগিরি পরিক্রম করিয়াছিলেন। তাহাঁর মুখে না শুনিলে মুঞ্জবান্ পর্বতের সে পারে রুদ্রের আলয় মানস নেত্রে স্পষ্ট হইত না।

নিমিত্ত এই পুরাণ লিখিয়াছিলেন। তিনি গুরুপূজাবিধিও দিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন রাজার পোষকতায় উপপুরাণের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তিনি নানাছন্দে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তান্ত্রিক মন্ত্র ও কবচ প্রকাশ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন স্মার্তাচার্য দেবীপুরাণ হইতে অনেক গুরুতর প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। যেমন "ইষে মাস্যসিতে পক্ষে" ইত্যাদি ইষ মাসে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনবমীতে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন। বর্তমান বঙ্গবাসী প্রকাশিত দেবীপুরাণে সেসব শ্লোক নাই। এক স্থানে (৮৯) আছে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্ল নবমী পর্যন্ত সর্বমঙ্গলার পূজা করিবে। এখানে বোধন কিম্বা পত্রী-প্রবেশের উল্লেখ নাই। আশ্বিন শুক্লঅষ্টমী ও নবমীতে দেবীপূজা (২১), আশ্বিন শুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত পূজা (২২) বিহিত হইয়াছে। ইহার সহিত পুরাতন বিধির বিরোধ হইতেছে।

পুরাণের দেশ নর্মদা ও বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ শৈব ছিলেন (১০০)। নিকটে জৈনেরা থাকিত। কবি তাহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়াছেন (১৩।১০)। উষ্ট্র এক যান ছিল। ঘটিযন্ত্র দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (৩৩।৭)। শমী কাষ্ঠের অরণি হইত। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে বর্বর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির বাস ছিল। তাহারা বামাচারে দেবী পূজা করিত। তাহাদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ, তাহারা গুঞ্জাবীজের আভরণ পরিধান করিত। দ্রোণ, বিশ্ব, আম্র,* জাতি, নাগ ও চম্পকপুষ্পে পূজার বিধি ছিল। সে দেশে নাগরাক্ষর প্রচলিত ছিল না (৯১।৫৩)। এইসকল লক্ষণ হইতে মনে হয়, এই দেশ বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে, রাজপুতনার দক্ষিণে অবস্থিত। বোধ হয় উজ্জয়িনী এই পুরাণের দেশ (৩২)।

এই পুরাণ রচনার কাল অনুমানের কয়েকটি ক্ষীণসূত্র পাওয়া যায়। এই পুরাণ মার্কণ্ডেয়পুরাণের পরবর্তী। কারণ, ইহাতে মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত 'সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে' ইত্যাদি নামের

* শরৎকালে আমের মুকুল কোথায় দেখা যায়? রঘুনন্দনধৃত ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে আম্রফল দিতে বলা হইয়াছে। ইহা কি দো-ফলা আম?

নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে (৩৭)। আরও লিখিত আছে, দেবী মহিষের বধার্থে দেবগণের তেজে পরিবৃত হইয়া জ্বালামালা সদৃশী (১৪২)। তিনি মহাদেবের তেজোময় শরীর হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় তেজে জ্বলন্তী। কালরাত্রি মহামায়া দীপ্তকাঞ্চনসপ্রভাতা (১২৭)। এই পুরাণে চন্দ্র সূর্য গ্রহণের কারণ বিচারে বরাহমিহিরের অনুকরণ আছে। পুরাণের নানাস্থানে নক্ষত্র তিথি করণের নাম আছে কিন্তু যোগের উল্লেখ নাই। (অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দে যোগ গণনা আসিয়াছে)। পুরাণকালে হূণ জাতি ভারতে আসিয়াছিল। একাদশ অবতারের নাম, যথা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি (৬), অর্থাৎ তৎকালে দশ অবতার গণনা বিধিবদ্ধ হয় নাই। বোধ হয় দেবীপুরাণ সপ্তম খ্রীষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এই পুরাণ মতে দেবী উগ্রসেন পুত্র কংসসেনকে নিহত করিয়াছিলেন (১০২)। গজাননের উৎপত্তি নূতন। বিষ্ণু স্বীয় পাণিতল মন্থন করিয়া গজাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১১২)। গণেশ মূর্তির বাম হস্তে পরশু ও মোদক, দক্ষিণ হস্তে অক্ষসূত্র ও অভয়দান অথবা দণ্ড ও মৎস্য (৫০।৩৯)। মূর্তির দক্ষিণ ভাগে রতি নাম্নী সুরূপা যুবতী মূর্তি। মহালক্ষ্মী কপাল-ধারিণী, নৃত্যমানা, হস্তে মুণ্ড ও খট্টাঙ্গ (৫০। ৫২)। দেবীর রথযাত্রা ও দোলযাত্রা (২১) কোন পুরাণে নাই। একটা উৎসব করিতে হইবে, এই ভাবিয়া রথযাত্রা (৩১) আসিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র কথা আছে।

কবি মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও মহাভারত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কবি মন্ত্রতন্ত্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু গারুড়ীর নিন্দা করিয়াছেন। (গারুড়ী মন্ত্র দ্বারা সর্পবিষ নষ্ট হয়)। কবি লিখিয়াছেন, পুলিন্দ, শবরাদি জাতি অষ্টবিদ্যা দেবীর বামাচারে পূজা করে। হূণদেশে, বরেন্দ্রে, রাঢ়দেশে ভোট্টদেশে, কামাখ্যায়, উজ্জয়িনীতে, ইত্যাদি স্থানে অষ্টবিদ্যাদেবীর অধিষ্ঠান আছে (৩৯।১৪৩-১৪৫)। "গুরু ভিন্ন আর কেহ সংসার হইতে নিস্তার করিতে পারে না।" এই পুরাণে সেই গুরু বহু ধন রত্ন ব্যয়ে বিবিধ রূপধারিণী দেবীর পূজা প্রচার করিয়াছেন। পুরাণে নবরাত্রের উল্লেখ নাই। প্রতিমায়, পটে

কিম্বা শূল খড়্গ বা পাদুকায় পূজা বিহিত হইয়াছে। বোধ হয় পুরাণের কালে ও দেশে নবরাত্র ব্রত প্রবর্তিত ছিল না। আশ্বিন কৃষ্ণনবমী হইতে শুক্লনবমী পর্যন্ত পূজায় নবরাত্র আসিতে পারিত না। কবি কতগুলি পীঠস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ওড্রদেশ (ওড়িষ্যা), স্ত্রীরাজ্য (কেরল), কামরূপ, উড্ডিয়ান (আসাম) ও বরেন্দ্র নাম আছে (৪২। ৮, ৯)।

কালিকাপুরাণ

কালিকাপুরাণ এক উপপুরাণ। পুরাণ হইতে উপপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণ মতে উপপুরাণ ব্যাসপ্রোক্ত নহে। ঋষির নাম না করিলে উপপুরাণ আদরণীয় হয় না। এই কারণে উপপুরাণের বক্তারূপে কোন দেব বা ঋষির নাম করা হইয়া থাকে। এইরূপে মার্কণ্ডেয় মুনি কালিকাপুরাণের বক্তা হইয়াছেন। রাজার আশ্রয় ব্যতীত উপ-পুরাণ লিখিত সদাচার, নীতিশাস্ত্র পূজাবিধি প্রভৃতির বর্ণনার সার্থকতা থাকে না। কালিকাপুরাণ কামরূপে কোন রাজার আদেশে রচিত হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার কবি গ্রহবিপ্র ছিলেন। গ্রহবিপ্রেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে আচার্য নামে খ্যাত। কবি জ্যোতিষ চর্চা করিতেন। দৈবযুগ ও মানুষ যুগ, যুগ গণনার দুই ক্রম আছে। দুই যুগের পরিমাণে বহু অন্তর। কালিকাপুরাণে যেখানে কোন ঘটনার উল্লেখ আছে, সেখানেই কবি মানুষ যুগের উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষযুগ মানুষের ব্যবহার-যোগ্য। কবি সেই যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, দৈবযুগের করেন নাই। কবে দক্ষের কতগুলি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কবি লিখিয়াছেন, মানুষ ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে (২২। ১৩)। কবে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বসন্ত কালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্ধরাত্রে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল (৪১)। অর্থাৎ সৌর চৈত্রমাস প্রবেশের দিন। তিনি চৈত্র বৈশাখ বসন্ত গণিয়াছেন। কবে শিবপার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল? কবি

বলিতেছেন, বৈশাখ মাসে পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে, যেদিন সূর্য ভরণীনক্ষত্রে প্রবেশ করেন (৪৪।৪৬)।*

কামরূপের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, যেহেতু পুরাকালে ব্রহ্মা কামরূপে থাকিয়া নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন (৩৮।১১৯)। এই ব্যাখ্যা সত্য নহে। মহাভারতে ও রামায়ণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দিক্‌ নির্ণয় আছে। সে দেশ শাকদ্বীপে, পেশোয়ারের উত্তরে, দিল্লীর পশ্চিমোত্তরে বোধ হয় বর্তমান চিত্রল নামক স্থানে ছিল। কবি স্বয়ং জ্যোতিষী না হইলে, শাকদ্বীপী না হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামের এই কাল্পনিক উৎপত্তি জানাইতে প্রয়াসী হইতেন না। মহাভারতে ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। কামরূপের এক বিখ্যাত রাজবংশ তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশ নামে কীর্তিত হইয়াছে। বোধ হয় এই রাজবংশের পূর্ব পুরুষ আর্যেতর জাতি ছিলেন। ভগদত্তের পিতার নাম নরক। নরক দুইটি, একটি স্বর্গীয়, অপরটি ভৌম। স্বর্গীয় নরক বলির ন্যায় এক দৈত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। দেবীপুরাণে নরক যমের অনুজ। ভৌম নরক ভূমি জাত, ভূমিজ, মৃত্তিজ, অর্থাৎ যে অন্য দেশ হইতে আসে নাই। কবি দুই নরককে অভিন্ন মনে করিয়া ভৌম নরকের পিতা বরাহরূপী বিষ্ণু এবং মাতা পৃথিবী বলিয়াছেন। এইরূপে কবি স্বীয় প্রতিপালক রাজার মহত্ত্ব বাড়াইয়াছেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পরে দিতেছি।

কালিকাপুরাণকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগে পুরাণ, দ্বিতীয় ভাগে কামরূপের মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি। রঘুনন্দন দুইখানা কলিকাপুরাণ পাইয়াছিলেন। তিনি একখানিকে 'দুষ্প্রাপ' বলিয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণ-উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুরাণ লুপ্ত

---

* গণিত দ্বারা জানিতেছি ইহা খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৭১ অব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তির পরদিন ও চন্দ্র নক্ষত্র আর্দ্রার পরদিন, বর্তমান পাঁজির ১৩ই বৈশাখ। আশ্চর্যের বিষয় বাঁকুড়ায় বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরে মহাজনেরা সেদিন নূতন খাতা খুলেন। সেদিন তাহাঁদের 'হালখাতা'। এক উপাখ্যানে আছে, সেদিন ধর্মপূজা-প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। তাহাঁর ডোমশিষ্যেরা ১৩ই বৈশাখ পুণ্যদিন মনে করে।

হইয়াছে। সে প্রমাণ পূজা-বিধির। বোধ হয় পুরাণের প্রথম ভাগে পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তনের কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় ভাগে দেবদেবীর ও কামরূপের বিশেষ বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির নিমিত্ত পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারিত। একটা উদাহরণ দিতেছি। মাঘ শুক্ল পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী। এক স্থানে আছে সেদিন শিবার পূজা করিবে (৫১।২৫)। অন্য দুই স্থানে আছে লক্ষ্মীর পূজা করিবে (৮৫।১০, ৮৮।২২)। দুইটিই পূজাবিধির ভাগে আছে।

উপাখ্যান ভাগের সহিত পূজাবিধি ভাগের ঐক্য নাই। প্রথম ভাগে লবঙ্গলতা যূথীর নাম (১০।৪২), দ্বিতীয় ভাগে লবঙ্গলতা না হইয়া যূথী নাম আছে (৬৯।৫৯)।

কবি প্রথম ভাগে মৎস্যপুরাণ হইতে হর-পার্বতীর বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, দশভুজাদেবীর রূপ ইত্যাদি, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে দেবীর স্বরূপ বর্ণনা, "সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে" ইত্যাদি শ্লোক, দেবীপুরাণ হইতে "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী" ইত্যাদি মন্ত্র ও পূর্ণিমান্ত আশ্বিন মাস গণনা ও আশ্বিন কৃষ্ণনবমীতে দেবীর পূজা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণের পরে রচিত হইয়াছিল। কত পরে তাহা বলা কঠিন। ষষ্ঠ প্রকরণে লিখিয়াছি, কালিকাপুরাণের ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর আবির্ভাব হইতে মনে হয় ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাহেশ্বর যুগের পর কালিকাপুরাণ রচিত হইয়াছিল। এই অনুমান অভ্রান্ত নয়। কারণ দেবীপুরাণেও কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর পূজা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালিকাপুরাণে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল প্রমাণ একত্র করিলে কালিকাপুরাণ অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দের বলিতে হইতেছে। কত বৎসর ইহাতে নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে তাহা বলা আরও কঠিন। দ্বিতীয় ভাগে (৮৮।৭০) বিষ্ণুধর্মোত্তরের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে বর্তমান কালিকাপুরাণ অষ্টম হইতে একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল। সপ্তম হইতে দশম খ্রীষ্টশতাব্দ পর্যন্ত আসামে শালভঞ্জ বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজার নিমিত্ত রাজনীতি, দুর্গ নির্মাণ, পুষ্য স্নানাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি শ্রীহর্ষদেব

(৭৩০-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। বোধ হয় কবি এই রাজার পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতের জ্ঞাতব্য পূজার যাবতীয় উপচার ও পূজাবিধি এই পুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হোম ও যজ্ঞের বিধি নাই। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্র দুর্লভ হইতেছিল, শাণ (ভঙ্গার অংশু দ্বারা নির্মিত) বস্ত্র সুলভ ছিল (৬৮।১২)।

দেবী-ভাগবত

বঙ্গদেশে দেবী ভাগবতের তাদৃশ প্রচার নাই। দক্ষিণভারতে শৈবদিগের মধ্যে ইহা এক প্রামাণিক গ্রন্থ। মহাভারতের টীকাকার নীল-কণ্ঠ দেবী-ভাগবতেরও টীকা লিখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুভাগবত বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত নামে খ্যাত। বহুকাল হইতে একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে, বিষ্ণুভাগবত ও দেবী-ভাগবত, এই দুই ভাগবতের মধ্যে কোন্‌টা পুরাণ, কোন্‌টা উপপুরাণ।

বৈষ্ণবদিগের মতে বিষ্ণুভাগবতই পুরাণ, দেবী-ভাগবত উপপুরাণ। শাক্তদের মতে ঠিক বিপরীত। কোন কোন পুরাণও দেবী-ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীযুত কালে তাহাঁর "পুরাণ নিরীক্ষণে" দুই ভাগবতের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক মত তুলিয়াছেন। এখানে সেসব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দুই তিন প্রকারে উক্ত তর্কের নিরাস করা যাইতে পারে। (১) কোন্ ভাগবতে পুরাণের লক্ষণ আছে, কোন্ ভাগবতে নাই? (২) কোন্ ভাগবতের ভাষায় প্রাচীনতা দৃষ্ট হয়, কোন্ ভাগবতে হয় না? (৩) কোন্ ভাগবত পরে রচিত হইয়াছিল? এই তিন তর্ক যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার বোধ হইয়াছে বৈষ্ণব-ভাগবতই পুরাণ, দেবী-ভাগবত উপপুরাণ।

বিষ্ণুভাগবত স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত। দেবী-ভাগবতও স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত, উভয়েই দ্বাদশ স্কন্ধ। কবির মতে দেবী-ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণুভাগবত উপপুরাণ। তিনি উপপুরাণের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, কালিকাপুরাণ, নন্দিপুরাণের নাম আছে

(১।৩।১৫)। অর্থাৎ কবি তাহাঁর পুরাণকে উক্ত তিন পুরাণের পরে আনিয়াছেন। এই শ্লোক পরে যোজিত মনে করিবার হেতু নাই।

কবি নানাবিধ ছন্দে তাহাঁর পুরাণ লিখিয়াছেন কিন্তু ভাষায় গাঢ়তা নাই। তিনি অনেক পুরাণ পড়িয়াছিলেন এবং সেসকল পুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে মহিষাসুর বধ (৫ম স্কন্ধ), ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভূলোকে অবতার, তুলসীর উপাখ্যান (৯ম স্কন্ধ), বিষ্ণুভাবত হইতে বৃত্রাসুর-বধ, বোধ হয় দেবী-পুরাণ হইতে সারস্বত বীজ (৩।১১) গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে কৃষ্ণ অবতার ইত্যাদি, মহাভারত হইতে রামায়ণ সংগ্রহ আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু কালিকাপুরাণের অনুকরণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী পূজা লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞকর্মে পশু-বধ অহিংসা। ইহাও দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণের অনুকরণ। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের "যুদ্ধং বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে" (৬।২)। এখানে কবি আপনাকে বিষ্ণুভাগবতের পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষ্ণুভাগবতের এক লক্ষণ। কবির সময়ে পঞ্চ-দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল (৯।৩৬)। ইহাও তাহাঁর অর্বাচীনত্বের প্রমাণ। শ্রীযুত কালে লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী দেবী ভাগবতের নাম করিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দে ছিলেন। এইসকল কারণে মনে হয় দশম খ্রীষ্টশতাব্দে এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

কাশী কিম্বা নিকটস্থ কোন স্থান দেবী-ভাগবত রচনার দেশ। কাশীর এবং কোশলের কয়েকটি উপাখ্যান এই পুরাণে নূতন। বিষ্ণু-ভাগবত দক্ষিণ-ভারতে, দেবী-ভাগবত উত্তর-ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। কবি নবরাত্র ব্রতবিধি আনুপূর্বিক লিখিয়াছেন (৩।২৬)। বসন্ত ও শরৎ দুই ঋতু যমদংষ্ট্রা। চৈত্র ও আশ্বিন দুই মাসেই দেবী পূজা কর্তব্য। "পুরাণং পঞ্চলক্ষণং" কবি এই পুরাণ পঞ্চ লক্ষণান্বিত করিয়াছেন। কবি বৈদিক গ্রন্থ হইতেও পুরাবৃত্ত সংকলন করিয়াছেন। এই একখানি পুরাণ পাঠ করিলে বহু পুরাণ পাঠের ফল লাভ হইবে, এই ভাবিয়া রচিত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ

বৃহদ্ধর্মপুরাণ একখানি উপপুরাণ। এই পুরাণ রচনার দেশ নিরূপণের মধ্যে দেখিতেছি, কবি বঙ্গের প্রসিদ্ধ ছত্রিশ জাতির নাম করিয়াছেন। যথা,—(১) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এই চারি শুদ্ধ জাতি; (২) প্রথম সংকর জাতি ২০; (৩) দ্বিতীয় সংকর জাতি ১২। মোট ছত্রিশ জাতি। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি অন্ত্যজ জাতি ছিল, তাহারা ছত্রিশ জাতির মধ্যে নহে। এইসকল জাতি কেবল বঙ্গদেশের মধ্যে রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। কবি প্রত্যহ গঙ্গাস্নায়ী হইতে বলিয়াছেন, ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, নারিকেল ও হিন্তাল বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব মনে হয়, তিনি ত্রিবেণীর নিকটে কোথাও; এই পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বেতস ও বেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বেতস হুগলী জেলায় নাই, বর্ধমান জেলায় ছিল। ভরত মল্লিকের সময়ে বয়সা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কবির জ্ঞাতিরা তদঞ্চলে বর্ধমান জেলার পূর্বোত্তর-অংশে বাস করিতেন। আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কালকেতু ব্যাধের, উজানী নগরের শ্রীমন্ত সদাগরের ও কালীদহে কমলে কামিনী আবির্ভাবের উপাখ্যান পাঠ করি। সে সে উপাখ্যানের বীজ বৃহদ্ধর্মপুরাণে এক এক শ্লোকে আছে। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এই পুরাণ হইতে দক্ষযজ্ঞ-নাশ ও আরও কতিপয় বিষয় লইয়াছেন।

পুরাণখানি পূর্ব, মধ্য ও উত্তর এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। পূর্বখণ্ডে তৎকাল প্রচলিত দেবদেবীর পূজার ও ব্রত আচরণের দিন নিরূপিত হইয়াছে। রঘুনন্দনে অধিক আছে। কোন কোন পূজায় প্রভেদ ঘটিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রঘুনন্দন মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতে বলিয়াছেন। এই পুরাণের কবি সেদিন শিবা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কালিকাপুরাণের এক স্থানে শিবার, অন্য স্থানে লক্ষ্মীর পূজা বিহিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই দুই দেবীর সহিত সরস্বতী আসিয়াছেন। সরস্বতীর প্রতিমাতে প্রভেদ ছিল। এই পুরাণে সরস্বতী শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা ও

ত্রিনেত্রা। তাহাঁর মস্তকে চন্দ্রকলা, হস্তে সুধা বিদ্যা মুদ্রা অক্ষমালা (পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৫।২৯)। চৈত্রশুক্ল পঞ্চমী আর এক শ্রীপঞ্চমী (পৃঃ ১৬)। সেদিন লক্ষ্মীপূজা।

কবি কালিকাপুরাণ মতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ কিছু মানিয়া কিছু ছাড়িয়া রামরাবণের যুদ্ধকালের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা হয়, এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সুগ্রীব ভল্লুক ও বানরগণ আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন (পৃ. ১৯)। (বাল্মিকী রামায়ণে আছে চারিমাস বর্ষার পরে যখন আকাশ ও সলিল নির্মল হইয়াছিল, অর্থাৎ শরৎকালে সুগ্রীব দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবি শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, এই চারি মাস বর্ষা ধরিয়াছেন। অতএব অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পৌষ-মাসে রামরাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল)। সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণিমার পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন (পৃ. ২১।২১)। সেদিন হইতে রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবীর অনুগ্রহ লাভার্থ আর্দ্রা নক্ষত্রসংযুক্ত কৃষ্ণনবমীতে বিল্ববৃক্ষে বোধন করিলেন। আশ্বিন শুক্ল নবমীর অপরাহ্লে রাবণ ধরাতলে পতিত হইল।

কবি বিধান দিয়াছেন, বোধনের দিন হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস বিল্বশাখায় পূজা করিবে। সপ্তমীতে সে শাখা গৃহে আনিয়া দিবসত্রয় পূজা করিবে। পনর (ষোল) দিন পূজা করিতে না পারিলে অষ্টমী, নবমী কিম্বা নবমীতে পূজা করিবে। কবি এক রাজার সভা-পণ্ডিত কিম্বা গুরু ছিলেন। সে রাজ্যে নিশ্চয় উক্ত বিধি অনুসারে দুর্গার অর্চনা হইত। আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠী সায়ংকালে বোধন হইত না, পত্রী প্রবেশ হইত না, বোধ হয় দুর্গার প্রতিমাও নির্মিত হইত না।

পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানিতে পারিতেছি কবির কালে রাঢ়ে হিন্দুরাজ্য ছিল, পরিখা খনন দ্বারা দুর্গ নির্মিত হইত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ বিভাগ ছিল, অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎকালে যবনের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। কেহ কেহ যবন সংসর্গ করিত, যবন ভাষায় কথা

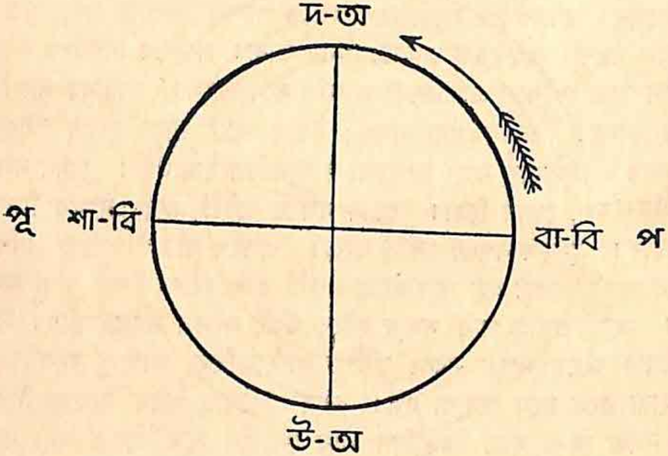
কহিত। এইসব লক্ষণ হইতে মনে হইতেছে পুরাণখানি চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাব্দের প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল।*

* এই প্রকরণ সমাপ্তি কালে বঙ্গবাসী প্রেসের স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুরাণশাস্ত্র-দান-কীর্তি স্মরণ করিতেছি।

পরিভাষা

১। অয়ন ও বিষুব। নির্মল অন্ধকার রাত্রে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় যেন এক বৃহৎ কটাহে অসংখ্য হীরক-খন্ড খচিত আছে। দিবাভাগে আকাশ সমুদ্রতুল্য নীলবর্ণ দেখায়। এই হেতু প্রাচীনেরা ইহাকে আকাশ-সমুদ্র বলিতেন, কখনও বা কেবল সমুদ্র বলিতেন। হীরকখন্ড সকল পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে থাকে। এই হেতু তাহাদের নাম তারা। পরস্পর নিকটস্থ কতকগুলি তারা দেখিলে এক একটা আকৃতি মনে আসে। তারাময় আকৃতির নাম নক্ষত্র। যেমন মঘা নক্ষত্র; ইহার ৫টি তারা হলের আকারে সজ্জিত। ইহাদের মধ্যে উজ্জ্বলতর তারাটির নাম মঘা। কোন নক্ষত্রে একটি তারা, যেমন চিত্রা। কোন নক্ষত্রে দুইটি, কোন নক্ষত্রে তিনটি, ইত্যাদি। কৃত্তিকানক্ষত্রে ছয়টি তারা। এক্ষণে সাতটি অক্লেশে গণিতে পারা যায়। বোধ হয় পূর্বকালে একটি তারা তেমন স্পষ্ট দেখা যাইত না। সূর্য প্রত্যহ পূর্ব সমুদ্র হইতে উঠে, পশ্চিম সমুদ্রে ডুবে। সূর্য উঠিবার আগে নক্ষত্র সকল দীপ্তি পাইতেছিল, আগন্তু সূর্যকিরণে তাহারা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়। সূর্য উঠিবার পূর্বে তাহার নিকটে যে নক্ষত্র দেখা যায়, কিছুদিন পরে সেখানে পূর্বদিকের অন্য নক্ষত্র দেখা যায়। এইরূপে পরে পরে পূর্বদিকের নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। অতএব, আমরা বুঝি সূর্য পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে নক্ষত্রগণের মাঝ দিয়া গমন করিতেছে। সূর্য এই ক্রমে যে পথে ভ্রমণ করে, তাহার নাম রবিপথ। সেটা এক বৃহৎ বৃত্ত। কোন নক্ষত্র (যেমন মঘা) হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করিয়া পুনর্বার সে নক্ষত্রের নিকটে আসিলে রবির বৃত্তপথ পূর্ণ হয়। রবিপথে চারিটি বিশেষ স্থান আছে। সে বিশেষ স্থানের নাম বিষুপদ। রবি এক বিষুপদে আসিলে দিবা পরম দীর্ঘ হয়, যেমন ২১ জুন। অন্য এক পদে আসিলে দিবা পরম হ্রস্ব হয়, যেমন ২২ ডিসেম্বর। কোন এক স্থান হইতে দিক্‌চক্রে সূর্যের উদয়-স্থান

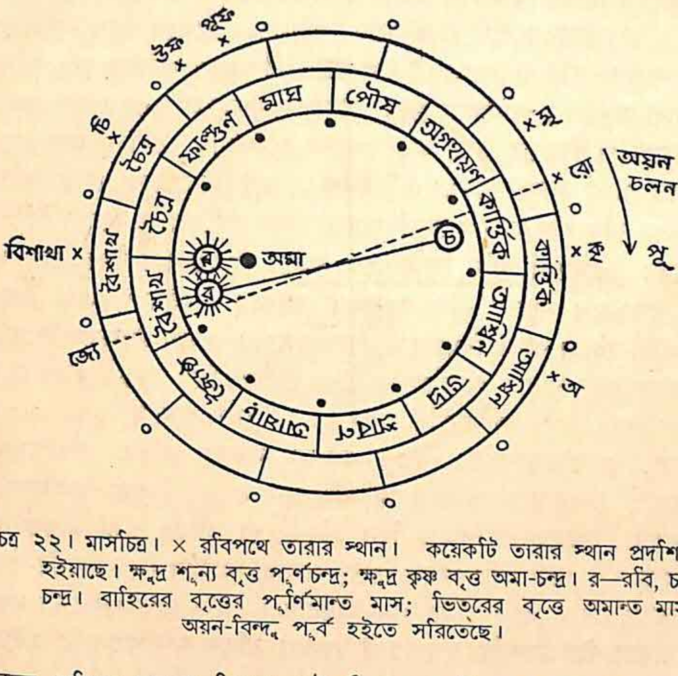
দেখিতে থাকিলে তাহাকে উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইতে দেখা যায়। যে যে বিষ্ণুপদে আসিলে রবির উত্তরা কিম্বা দক্ষিণা গতি হয়, তাহাদের নাম আয়ন পদ বা অয়ন-বিন্দু। অপর দুই বিষ্ণু-পদে আসিলে দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হয়। এই দুই পদের নাম বিষুব পদ বা বিষুব বিন্দু; যেমন ২১ মার্চ্ ও ২২ সেপ্টেম্বর। বসন্তকালের বিষুব পদ বাসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব এবং শরৎ কালের বিষুব পদ শারদ বিষুব বা জলবিষুব (চিত্র ২১)।



চিত্র ২১। অয়নাদি ও বিষুব। বা-বি—বাসন্ত বিষুব, দ-অ—দক্ষিণায়নাদি, শা-বি—শারদ বিষুব, উ-অ—উত্তরায়ণাদি

এই চারি বিষ্ণুপদ দ্বারা রবিপথ চারি পাদে বিভক্ত হইয়াছে। বৃত্তকে ৩৬০ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম অংশ (ডিগ্রী); অংশকে ৬০ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম কলা (মিনিট); কলাকে ৬০ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম বিকলা (সেকেণ্ড)। এক এক রবি-চক্রপাদে ৯০° অংশ। দুই অয়নের অন্তর ১৮০° অংশ। দুই বিষুবের অন্তরও ১৮০° অংশ (চিত্র ২১)।

চন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নক্ষত্রগণের মাঝ দিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আজ যে সময়ে যে নক্ষত্রের নিকট চন্দ্র দেখা যায়, কাল সে নক্ষত্র ছাড়িয়া পূর্বদিকে আর এক নক্ষত্রে দেখা যায়। এইরূপে প্রতিদিন এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে প্রায় ২৭।২৮ দিন পরে চন্দ্র প্রথম নক্ষত্রের নিকটে ফিরিয়া আসে। এইহেতু চন্দ্রপথে ২৭ দিনে ২৭টি নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। পুরাণে ২৭টি নক্ষত্রনাম্নী



চিত্র ২২। মাসচিত্র। × রবিপথে তারার স্থান। কয়েকটি তারার স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র শূন্য বৃত্ত পূর্ণচন্দ্র; ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বৃত্ত অমা-চন্দ্র। র—রবি, চ—চন্দ্র। বাহিরের বৃত্তের পূর্ণিমান্ত মাস; ভিতরের বৃত্তে অমান্ত মাস। অয়ন-বিন্দু পূর্ব হইতে সরিতেছে।

কন্যার সহিত চন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। এই ২৭ নক্ষত্রের নাম,— ১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিণী, ৫। মৃগশিরা, ৬। আর্দ্রা, ৭। পুনর্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতী, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা,

২০। পূর্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া, ২২। শ্রবণা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্বভাদ্রপদা, ২৬। উত্তর ভাদ্রপদা, ২৭। রেবতী। কিন্তু এইসকল নক্ষত্র (তারাময় আকৃতি) সমান সমান দূরে নয়। জ্যোতির্বিদেরা রবিপথ ২৭ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া যে তারাময় আকৃতি যে ভাগে পড়ে, সে নক্ষত্রের নামে সে ভাগের নাম রাখিয়াছেন। নক্ষত্র ২৭টি; অতএব কোন এক নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৷৷ নক্ষত্রগতে অর্থাৎ ১৪শ নক্ষত্রে রবি-বা চন্দ্র-পথের অর্ধাংশ (চিত্র ২২)।

রবি মৃদু মৃদু পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছে, চন্দ্র দ্রুতবেগে হইতেছে। রবি ও চন্দ্র একই নক্ষত্রের একই অংশে থাকিলে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না; অমাবস্যা হয়। আর, সন্ধ্যাকালে ১৩৷৷ নক্ষত্র অন্তরে থাকিলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়; সেদিন পূর্ণিমা। সেদিন চন্দ্র-সূর্যের অন্তর ১৩৷৷ নক্ষত্র বা ১৮০° অংশ। দুই বিষুবেরও সেই অন্তর। অতএব রবি যদি এক অয়ন-বিন্দুতে অস্ত যায়, অপর অয়নে পূর্ণিমা হইবে। এইরূপ, যদি কোন এক নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তবে তাহার ১৪শ নক্ষত্রে রবি অস্তগত হইবে। এইরূপ, এক বিষুবে পূর্ণিমা হইলে অপর বিষুবে সূর্যাস্ত হইবে। একটা উদাহরণ দিতেছি। পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিতেছি। (১) তখন সূর্য-নক্ষত্র কত? পূর্বফল্গুনীর অঙ্ক ১১। অতএব সূর্য ১১+১৪=২৫ নক্ষত্রে, পূর্বভাদ্রপদায়। (২) কোন্ নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়নাদি হইবে? [অয়নাদি=অয়নের আদি বা আরম্ভ]। নিশ্চয় পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে। যেহেতু পূর্ণিমার দিন রবি-চন্দ্রের অন্তর ১৩৷৷ নক্ষত্র এবং যেহেতু দুই অয়নাদির মধ্যেও সেই অন্তর, অতএব যে অয়নাদি-নক্ষত্রে পূর্ণিমা, সে নক্ষত্রেই রবির অন্য অয়নাদি। যদি পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে চন্দ্রোদয়ে উত্তরায়ণাদি হয়, সেই নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়নাদি হইতেই হইবে।

রাশি নক্ষত্র তিথি

রবি এক বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে। এক তারা হইতে সে-তারায় পুনরাগমন হইতে রবির যতদিন লাগে তাহা বৎসরের পরিমাণ।

এই বৎসর নাক্ষত্র বৎসর। ইহা ৩৬০° অংশে বিভক্ত। এই বৃত্তকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম রাশি। ∴ ১ রাশি=৩০° অংশ। রবির এক রাশি ভ্রমণ কালের নাম এক সৌর মাস। কিন্তু বৃত্তের আদি নাই, অন্ত নাই। কোন্ বিন্দু হইতে ১২ ভাগ করা যাইবে? এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে ৪২১ শকে (৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) যে বিন্দুতে বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল, সেই বিন্দু রাশি-ভাগের আরম্ভ। কিন্তু পূর্বকাল হইতে যে পারম্পর্য চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত এই আদি বিন্দুর বিরোধ ঘটে। এই কারণে ৪২১ শক পরিত্যাগ করিয়া ২৪১ শকের (৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের) বাসন্ত-বিষুব স্থানে আদি-বিন্দু স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে বৎসর গুপ্তাব্দেরও আরম্ভ।

সে বৎসরকে ৬ ঋতুতে ভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বসন্ত	চৈত্র	৩৩০°—৩৬০°	(বাসন্ত-বিষুব)
	বৈশাখ	০°—৩০°	
গ্রীষ্ম	জ্যৈষ্ঠ	৩০°—৬০°	
	আষাঢ়	৬০°—৯০°	(দক্ষিণায়নাদি)
বর্ষা	শ্রাবণ	৯০°—১২০°	
	ভাদ্র	১২০°—১৫০°	
শরৎ	আশ্বিন	১৫০°—১৮০°	(শারদ-বিষুব)
	কার্তিক	১৮০°—২১০°	
হেমন্ত	অগ্রহায়ণ	২১০°—২৪০°	
	পৌষ	২৪০°—২৭০°	(উত্তরায়ণাদি)
শিশির	মাঘ	২৭০°—৩০০°	
	ফাল্গুন	৩০০°—৩৩০°	

শিশির ঋতুর বৈদিক নাম হিম·। দেখা যাইতেছে সূর্য ১৫০° অংশে আসিলে শরৎঋতুর আরম্ভ হয়।

তারা স্থির আছে। উক্ত বৎসরের পরিমাণও স্থির আছে। তারার তুলনায় বিষুব-বিন্দু মৃদুগতিতে পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে। প্রায় ৭২ বৎসরে ১ অংশ। ২৪১ শকে বাসন্ত-বিষুব বিন্দু যে তারার সমসূত্রে ছিল, পরে উভয়ের মধ্যে অন্তর দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান ১৮৬৮ শকে ১৮৬৮–২৪১=১৬২৭ বৎসরে সে অন্তর ২২·৬৫ অংশ হইয়াছে। এই অন্তর গমন করিতে রবির প্রায় ২৩ দিন লাগে। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ৩০ দিন। এই হেতু ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিন বিষুব দিন হইতেছে। ভাদ্র মাসে ৩১ দিন; এই হেতু ৮ই ভাদ্র ইষ মাসের আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু আমরা ২৪১ শকের মাস ও ঋতু বিভাগ মানিয়া চলিয়াছি।

বিষুব-বিন্দুর পশ্চিমগতি যত, বলা বাহুল্য, অয়নাদি বিন্দুরও তত। এক অয়নাদি হইতে সেই অয়নাদিতে পুনরাগত হইতে রবির যত দিন লাগে, তাহার নাম, সায়নবর্ষ। অয়নের সহিত যুক্ত বলিয়া নাম সায়ন। অয়নের সহিত যুক্ত না হইলে নিরয়ণ। ইহার ১২ ভাগের ১ ভাগের নাম আর্তব মাস। সায়নবর্ষের পরিমাণ ৩৬৫·২৪২২ দিন। নাক্ষত্র বা নিরয়ণ বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫.২৫৬৪ দিন। যেহেতু এই সময়ের মধ্যে অয়নবিন্দু প্রায় ৫০ বিকলা পশ্চাদ্‌গত হয়, সেহেতু সায়নবর্ষ পরিমাণ ঊনা হয়। নিরয়ণ বর্ষ অচল ঠাট, সায়নবর্ষ সচল ঠাট বলা যাইতে পারে। সায়নবর্ষের মাস ও ঋতু বিভাগ এইরূপ—

শিশির	তপস্	২৭০°—৩০০°
	তপস্য	৩০০°—৩৩০°
বসন্ত	মধু	৩৩০°—৩৬০° (বাসন্ত-বিষুব)
	মাধব	০°—৩০°
গ্রীষ্ম	শুক্র	৩০°—৬০°
	শুচি	৬০°—৯০° (দক্ষিণায়নাদি)

বর্ষা	নভস্	৯০°—১২০°
	নভস্য	১২০°—১৫০°
শরৎ	ইষ	১৫০°—১৮০° (শারদ বিষুব)
	উর্জ	১৮০°—২১০°
হেমন্ত	সহস্	২১০°—২৪০°
	সহস্য	২৪০°—২৭০° (উত্তরায়ণাদি)

রবিপথ-বৃত্ত ২৭ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র। অতএব এক নক্ষত্র=৩৬০÷২৭=$\frac{৪০}{৩}$=১৩°২০′ অংশাদি। সেই একই আদি-বিন্দু হইতে নক্ষত্র ভাগ হইয়াছে। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে। রবি যে নক্ষত্র-ভাগে থাকে তাহার নাম রবিনক্ষত্র। চন্দ্র যে নক্ষত্রভাগে থাকে তাহা চন্দ্রনক্ষত্র। পাঁজিতে প্রতি দিনের যে নক্ষত্রের নাম থাকে তাহা চন্দ্রনক্ষত্র। চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহ রাশিচক্রের বা নক্ষত্রচক্রের যত অংশাদি অতিক্রম করিয়াছে, তাহার নাম ভোগ।

তিথি এক কাল-মান। রবি ও চন্দ্র পূর্বদিকে গমন করিতেছে। রবির গতি মন্দ। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। চন্দ্রের গতি দ্রুত। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। অমাবস্যায় রবি ও চন্দ্রের ভোগ সমান হইয়া থাকে। চন্দ্র রবিকে ছাড়িয়া পূর্বদিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। উভয়ের ১২° অংশ অন্তর হইতে যত দণ্ডাদি লাগে, তাহার নাম তিথি। ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র মাস। ১, ২, ৩ ইত্যাদি গণিয়া গেলে পূর্ণিমা ১৫ তিথি, অমাবস্যা ৩০ তিথি। ১২° অংশকে নক্ষত্র করিলে,

$$\frac{১২\times৩}{৪০}=\frac{৯}{১০}\text{ নক্ষত্র।}$$

তিথির অর্থ হইতে পাইতেছি,

$$\frac{চ^\circ - র^\circ}{১২} = তি।$$

এখানে চ° চন্দ্রের ভোগাংশ, র° রবির ভোগাংশ, তি তিথির সংখ্যা। রবি ১৫০° অংশে আসিলে শরৎঋতুর আরম্ভ ও আশ্বিন শুক্লনবমীর অন্ত। তখন চন্দ্র ভোগাংশ কত?

শুক্লনবমী=৯×১২=১০৮°। র=১৫০°। অতএব চ=১০৮+১৫০°=২৫৮°। ইহাকে নক্ষত্রে আনিলে ২৫৮×$\frac{৩}{৪০}$=১৯.৩৫ নক্ষত্র অর্থাৎ ১৯ নক্ষত্র গতে ২০ নক্ষত্রের অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়ার ৩৫ শতাংশ গত। অথবা, নক্ষত্রে গণিলে রবি ১৫০×$\frac{৩}{৪০}$=১১·২৫ নক্ষত্র। তিথি শুক্ল-নবমী=৯×$\frac{৯}{১০}$=৮·১, অতএব চন্দ্র নক্ষত্র=৮·১+১১·২৫=১৯·৩৫।

রঘুনন্দনধৃত দেবীপুরাণ মতে আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র কৃষ্ণনবমীতে নবম্যাদি-কল্প আরম্ভ হয়। সেদিন রবির ভোগ কত? পূর্বদিন ধরি। কৃষ্ণ-অষ্টমী=২৩ তিথি। চন্দ্র নক্ষত্র, মৃগশিরা=৫ন=৫×$\frac{৪০}{৩}$=৬৬·৬ অংশ।

চ°−র°=১২×তি। ৬৬·৬−র=১২×২৩=২৭৬°। অতএব র=২৭৬°−৬৬·৬°=২০৯°৪।

+র=৩৬০°−২০৯·৪°=১৫০·৬°।

দেখা যাইতেছে কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিনে রবি শরৎঋতুতে প্রবেশ করে। নবমী শরৎঋতুর প্রথম দিন।

মাহেশ্বর যুগ

এই যুগ অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। শতাধিক বর্ষ হইল জন বেণ্টলী নামে এক ইংরেজ বঙ্গদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্গণিত চর্চা করিতেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষণা বিকৃত ও হিন্দু জ্যোতিষের প্রতি

বিদ্বেষপ্রসূত। তিনি এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাঁর পুস্তকের নাম *Historical view of Hindoo Astronomy.* (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খন্ড আছে।) তাহাতে সংক্ষেপে কয়েকটা যুগের তালিকা আছে। কিন্তু কোন বিবরণ নাই, যুগের উপযোগ নাই, প্রয়োগও নাই। বোম্বাইয়ের জ্যোতির্বিৎ কেতকর মহাশয় সেই তালিকা পুনরুদ্ধার করিয়া প্রয়োগ বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক যুগ শুক্ল-সপ্তমীতে আরম্ভ হইয়াছে। যুগের পরিমাণ=২৪৭ সায়নবর্ষ ১ মাস। প্রথম যুগ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়া ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগ পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়াছিল। আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীর নাম আদিকল্পষষ্ঠী ছিল। বোধ হয় কল্প শব্দের অর্থ যুগ। আদিকল্প-ষষ্ঠী প্রথম যুগের ষষ্ঠী, সেদিন রবির ভোগ ১৫০° অংশ হইয়াছিল। পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। তৃতীয় যুগ কার্ত্তিক শুক্লসপ্তমীতে হইয়াছিল ইত্যাদি ক্রমে এক এক যুগ এক এক মাস আগাইয়া আসিয়াছিল। খ্রী-পূ ১৪৪০ (শকপূর্ব ১৫১৭) অব্দে প্রথম যুগ। সে যুগের বৈশাখ শুক্লতৃতীয়া বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল। পাঁজিতে অক্ষয়া তৃতীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রাবণ শুক্লপঞ্চমীতে দক্ষিণায়নাদি। সেদিন নাগপঞ্চমী। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে শারদ-বিষুব। পাঁজিতে এই দিনের বিশেষ নাম পাওয়া যায় না। মাঘ শুক্ল-একাদশীতে উত্তরায়ণাদি। সেদিন ভীম-একাদশী নামে খ্যাত। এই চারি দিনের প্রসিদ্ধি ও ঐক্য হেতু আমি মনে করি খ্রী-পূ ১৪৪০ অব্দে এই যুগমালিকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অন্য প্রমাণও আছে। বেণ্টলী এইসকল যুগের কোন নাম দেন নাই। কেতকরও কোন নাম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সোমসিদ্ধান্তে (মধ্যমাধিকারে) এক গার্গ্য শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার অর্থ অধুনা সপ্তম মনুর অষ্টা-বিংশ দ্বাপরে মহেশ্বর ব্রহ্মা হইয়াছেন। অর্থাৎ, মহেশ্বর কালবিভাগ-কর্তা হইয়াছেন। বায়ুপুরাণে (৩২) চতুর্মুখ মহেশ্বর সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের কর্তা হইয়াছেন। চতুর্মুখ মহেশ্বরের প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত ও বায়ুপুরাণের শ্লোক হইতে

আমার মনে হয় এই যুগের নাম মাহেশ্বর যুগ ছিল। মাহেশ্বর যুগের কয়েকটি তিথি ধরিয়া আমাদের কয়েকটি পূজার তিথি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মাহেশ্বর যুগ সাহায্যে বিষুব, অয়নাদি ও আর্তব মাস সংক্রান্তি দিনের তিথি বাহির করিতে পারা যায়। ১২ আর্তব মাসে ১২ যুগ পূর্ণ হয়। অতএব ১২×২৪৭$\frac{১}{১২}$=২৯৬৫ সায়নবর্ষে যুগ-চক্র একবার আবর্তন করে। খ্রী-পূ ১১৯৩ অব্দে=১২৭০ শকপূর্বে আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ২৯৬৫–১২৭০= ১৬৯৫ শকেও সেইরূপ যুগ আসিয়াছিল। বর্তমান ১৮৬৮ শকে সে যুগ চলিতেছে।

উদাহরণ দ্বারা যুগের উপযোগিতা দেখাইতেছি। উদাহরণ ১। ১৮৬৮ শকে বাসন্ত-বিষুব দিনে কি তিথি হইয়াছিল? শকের পঞ্চম মাসে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব সে বৎসরের ৭ মাস অবশিষ্ট ছিল। ১৮৬৮ শকের বাসন্ত বিষুব দিন=১৮৬৭ বৎসর+১২ মাস। এখন বিয়োগ কর,—

১৮৬৭+১২
১৬৯৫+ ৭
———————
১৭২ বৎসর+৫ মাস

সায়ন বৎসরে ১১·০৪৮ তিথি
মাসে ·৯২ তিথি বৃদ্ধি হয়।

অতএব

১৭২×১১·০৪৮=	১৯০০·২৬
৫×·৯২=	৪·৬০
যুগারম্ভে গত	৬·০
	১৯১০·৮৬

৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ ২০·৮৬ তিথি থাকে। অর্থাৎ সেদিন ২১ তিথি কৃষ্ণষষ্ঠী হইয়াছিল। কোন্ চান্দ্রমাসের? আমরা জানি বাসন্ত-বিষুব দিন চৈত্র মাসের ৭ই হইয়াছিল। অতএব সেদিন চান্দ্রচৈত্র হইতে পারে না। পূর্ববর্তী চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণষষ্ঠী হইয়াছিল।

২। ১৮৬৮ শকের উত্তরায়ণাদি দিবসে কি তিথি ছিল? ২৭০° অংশে উত্তরায়ণাদি, ও নবম আর্তব মাস আরম্ভ। অতএব

১৮৬৮+৯
১৬৯৫+৭

১৭৩ বর্ষ ২ মাস গত

১৭৩ বর্ষে ১৭৩×১১·০৪৮	=	১৯১১·৩০ তিথি
২ মাসে ২×·৯২	=	১·৮৪
যোগ	=	৬·০
		১৯১৯·১৪

৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ ২৯·১৪ থাকে। ৭ই পৌষ উত্তরায়ণাদি। সেদিন চান্দ্রপৌষ অমাবস্যা হইতে পারে না। অতএব চান্দ্র অগ্রহায়ণ অমাবস্যা।

অথবা, সে বৎসর বাসন্ত-বিষুব দিনে তিথি ২০·৮৬। ৯ মাসে ৮·২৮ তিথি বৃদ্ধি। যোগ করিলে ২৯·১৪ তিথি হয়। রবির ভোগ জানা আছে। তিথি জানা গেল। পূর্বপ্রদত্ত সমীকরণ দ্বারা নক্ষত্র পাওয়া যাইবে। তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে পরিকল্পিত যুগদ্বারা অদ্যাপি প্রায় শুদ্ধফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নয়।

বৎসর যুগ মনু

প্রয়োজনানুসারে বহুবিধ কালমান প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে মানুষমান ও দেব বা দৈবমান প্রসিদ্ধ। মানুষের ব্যবহারের নিমিত্ত মানুষমান ও নৈসর্গিক ঘটনার কাল জ্ঞাপনের নিমিত্ত দৈবমান। আমাদের দিবস, বৎসর, যুগ বা কতিপয় বৎসরের সমষ্টি আছে। দৈবমানেও তেমন দিবস বৎসর ও যুগ আছে। আমাদের ছয় মাসে উত্তরায়ণ, দৈবমানে নাম দৈবদিবা। ছয়মাস দক্ষিণায়ন দৈবরাত্রি। আমাদের এক বৎসর এক দৈবদিবস। আমাদের ৩৬০ বৎসর দৈববৎসর ইত্যাদি।

বর্তমানে আমাদের দৈবমানে প্রয়োজন নাই। যাহা লিখিতেছি, তাহা মানুষমানের বুঝিতে হইবে।

১ কল্প যুগ-সহস্র অর্থাৎ ৪000 বৎসর। ১ কল্পে ১৪ মনু বা মন্বন্তর। অতএব ১ মনু-কাল ২৮৫·৭ বৎসর। কিঞ্চিদধিক ৭১ যুগে ১ মনু। অতএব ১ যুগ=৪ বৎসর। এই চারি বৎসরের নাম কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এখানে এই চারি নাম চারি বৎসরের, যুগের নয়। ইহার প্রমাণ দিতেছি। মহাভারতে বনপর্বে পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে লোমশ ঋষি বলিতেছেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা ত্রেতা-দ্বাপরের সন্ধি।" (১২১।১৯)। আর এক স্থানে (১২৫।১৪), সেইরূপ কথা আছে। পাণ্ডবেরা বনবাসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় মধ্যে অন্ততঃ দুইবার ত্রেতা-দ্বাপরের সন্ধি হইয়াছিল। আর একস্থানে (১৪৮।৩৭), ভীম ও হনুমানের তর্ককালে উক্ত হইয়াছে, "অচিরে কলিযুগ প্রবর্তিত হইয়াছে।" অতএব ৪ বর্ষে ১ যুগ জানিতে হইতেছে। এই মনু-গণনার আদি কোথায়? সেই আদি আমাদের জ্ঞাত কোন অব্দ দ্বারা ব্যক্ত না করিলে মনু দ্বারা কাল নির্ণয় হইতে পারে না। নানা কারণে আমার মনে হইয়াছে, খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে মনুগণনার আদি বা কল্পাদি। এই বৎসর রোহিণী তারার সমসূত্রে বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-নবমী, পরদিন শুক্লদশমী আমরা দশহরা নামে পালন করিতেছি। এখন আমরা সপ্তম মনু, বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরের খ্রীষ্টাব্দ পাইতেছি। যথা। কল্পাদি=খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে গত, ৬ মনু ২৮৪×৬=১৭০৪ বৎসর, সপ্তম মনুর ২৭ যুগ ৪×২৭= ১০৮, কৃত ত্রেতা দ্বাপর ৩ বর্ষ=১৮১৫ বর্ষ। খ্রী-পূ ৩২৫৬—১৮১৫ =খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দ। ইহা কলি বৎসর। অতএব খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর প্রথম মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। অতএব ২000 বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ খ্রী-পূ ৩২৫৬—২000=১২৫৬ অব্দের পরে অষ্টম মনু সার্বর্ণি মনু আরম্ভ হইয়া ২৮৪ বৎসর চলিয়াছিল।

ঋগ্‌বেদের কাল হইতে যাজ্ঞিকেরা পাঁচ বৎসরে যুগ গণনা করিতেন। এই পাঁচ বৎসরের সম্বৎসর, পরিবৎসর ইত্যাদি পাঁচ নাম ছিল। পুরাণে ও পাঁজিতে এই পাঁচ বৎসরের নাম আছে।

কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ প্রসিদ্ধ। প্রথমে প্রত্যেক যুগের পরিমাণ সহস্র মানুষবর্ষ ছিল। চারি যুগে চারি সহস্র বৎসর এক কল্প। পরে ধর্মের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে কলির পরিমাণ ১২০০ মানুষ বৎসর হইয়াছিল। দ্বাপর কলির দ্বিগুণ, ত্রেতা ত্রিগুণ, কৃত বা সত্য চতুর্গুণ। একুনে চারি যুগে দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়াছিল। পাঁজিতে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরিমাণ লিখিত হইতেছে তাহা দৈবযুগের। মানুষকলি ১২০০ মানুষবৎসর, দৈবকলি১২০০×৩৬০= ৪৩২০০০ মানুষবৎসর। তদনুসারে মন্বন্তরাদি দৈবমানে অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে। পাঁজিতে দৈবমান লিখিত হয়।

নির্ঘণ্ট